পরমহংস

পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী।

[প্রথম খণ্ড]

১৩৪৪ সাল।

প্রকাশক—শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল।
"আনন্দ-ধাম"
২সি, ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ঃ—শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য-প্রশিষ্যদিগের জন্য—১।০
সাধারণের জন্য—১৲

[বিক্রয়-লব্ধ উপস্বত্ব, চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে, তাঁহার নিত্য পূজা ও ভোগাদির জন্য ব্যয়িত হইবে।]

প্রিণ্টার—শ্রীঅমূল্য চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
নিউ সারদা প্রেস
২১, আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা



পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ পূর্ণানন্দ স্বামী

[অবির্ভাব ২৮শে ভাদ্র, ১২৪১ বং] [তিরোভাব ১৭ই বৈশাখ, ১৩৩৫

পত্রাবলীর প্রকাশ পরিচয়।

চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রম এবং কামাখ্যা কালীপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, পরমারাধ্য পরম গুরুদেব পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ পূর্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ সেন (বর্ত্তমানে শ্রীহট্ট, মুরারীচাঁদ কলেজের গণিতের অধ্যাপক) যে সময় কলিকাতা শ্যামবাজারে থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে এম্-এ পড়িতেন, সেই সময় প্রায় তাঁহার নামে শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্র আসিত। পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে একদিকে যেমন গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের অনাবিল প্রেমের মাধুর্য্য, অপরদিকে তেমনি গভীর তত্ত্ব-কথায় পরিপূর্ণ দেখিয়া মনে হইত পত্রগুলি যদি কখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম-পিপাসুগণের বিশেষ উপকার হইবে।

১৩৩৭ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী যখন ছাপা হইতেছিল, সেই সময় ধর্ম্ম-পিতৃব্য পূজনীয় জগচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের পত্রে জানিতে পারি, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু পত্র সংগ্রহ করিয়া ছাপাইবার উপযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত সালের ৭ই কার্ত্তিকের এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—"গুরুদেবের পত্রগুলি ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, সেই জন্য এক দুঃখ আছে।" তদুত্তরে জানি না কাহার প্রেরণায় এ-অধম লিখিয়াছিল—"পত্রাবলী ছাপাইবার সমস্ত ভার আমি লইতে পারি।" জগৎ বাবুর পরলোক গমনের পরে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী পত্রগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। দুঃখের বিষয় গত কয়েক বৎসর নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় পত্রাবলীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।

কর্ম্ম-জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পত্রাবলী প্রকাশের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হই। কিন্তু একে ভগ্নস্বাস্থ্যে প্রায় শয্যাশায়ী—তাহাতে উপযুক্ত অর্থাভাব, এই সব কারণে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁহার চরণে প্রাণের বেদনা নিবেদন ভিন্ন আর কিছু সম্বল ছিল না। দৈবক্রমে এক দিন স্বপ্নযোগে ঠাকুরের

সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিলাম—"সুরেশ দা'! পত্রাবলী ছাপাইতে পারিবা"। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার তিন দিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম ভক্ত শিষ্য, কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত এটর্ণী পুজনীয় শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ধর্ম্ম-পিতৃব্য মহাশয় স্নেহবশে আমাকে দেখিতে আসিয়া—কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"পত্রাবলী ছাপাইবার ব্যবস্থা করুন—অর্থের জন্য ভাবিবেন না।"

লেখা বাহুল্য শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর বাবুর অর্থ সাহায্যেই পত্রাবলীর প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইল। আশা করি শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যবর্গ, পত্রাবলীর অপর তিন খণ্ড অতি শীঘ্র ছাপাইবার ব্যবস্থা করিবেন, কারণ জগৎ বাবুর সংগৃহীত পত্রগুলি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

এই খণ্ডে ৭৩ খানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। [পত্রগুলি শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ত্তৃক শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় (বর্ত্তমানে পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভূমানন্দ স্বামী)—শ্রীমতী প্রতিভা দেবী (প-প্র), শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন (সু), শ্রীজগচ্চন্দ্র দাস (জ), শ্রী নগেন্দ্র নাথ সেনকে (ন) লিখিত হইয়াছিল।] ব্যয় সঙ্কোচনার্থ পত্রগুলিতে ব্যক্তিগত অংশ একরূপ বাদ দিয়া জগৎবাবু যেরূপ সজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহাই রক্ষিত হইয়াছে; কেবল পত্রগুলির বিশেষ বিশেষ অংশ চিহ্নিত ও বড় টাইপ্ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে।

ডুমকা লগনস্থ "কেশবাশ্রমের" শিষ্য (শ্রীশ্রী ঠাকুরের প্রশিষ্যের শিষ্য) শ্রীমান্ ফণীন্দ্র নাথ দত্ত (ফতু) বাবাজী আমাকে প্রেসের কার্য্যে সহায়তা করিয়া বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছে।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্-এ, বি, এল্ এবং ডাঃ মহেন্দ্র নাথ সরকার এম্-এ, পি, এইচ্, ডি, মহাশয়দ্বয় পত্রাবলীর উপযুক্ত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া—'পত্রাবলী' প্রকাশে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ঝুলন-পূর্ণিমা, ৫ই ভাদ্র।
১৩৪৪ সাল।
খাঁটুরা (গোবরডাঙ্গা), ২৪পরগণা

বিনীত—
শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল।

ভূমিকা

(১)

চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামীজি ১৩৩৫, ১৭ই বৈশাখে দেহরক্ষা করিয়াছেন। এই বাংলাদেশে স্বামীজির অনেক শিষ্য প্রশিষ্য ছিলেন ও আছেন। তাঁহারা স্বামীজিকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ভক্তি করেন। স্বামীজি জীবদ্দশায় তাঁহার শিষ্যদিগকে বহু পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর তৎশিষ্য অধুনা পরলোকগত জগচ্চন্দ্র দাস মহাশয় ঐ সকল পত্রের অনেকগুলি সংগ্রহ করেন এবং ছাপাইবার উপযুক্ত করিয়া সজ্জিত করেন। সেই সকল পত্রাবলীর প্রথম খণ্ডে এখন প্রকাশ হইতে চলিল। পত্রাবলীর অপর তিন খণ্ড বোধ হয় অনতিচিরে প্রকাশিত হইবে। এই প্রথম খণ্ডে যে সকল পত্র সংগৃহীত হইয়াছে, একখানি ছাড়া সে সমস্তই ১৩১৮ বঙ্গাব্দে স্বামীজি কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল।

পত্রগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় উহারা গভীর তত্ত্ব-কথায় পরিপূর্ণ এবং অনাবিল ভগবৎ ভক্তির উচ্ছ্বাসে মুখরিত। স্বামীজির শিষ্যবর্গ ঐ সকল পত্র যাহাতে স্থায়ী আকারে রক্ষিত হয় তজ্জন্য আয়োজন করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ঐ সকল পত্রে স্বামীজি নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের

জোয়ার ভাটা সম্বন্ধে অনেক আন্তরিক কথা বলিয়াছেন। সে কথাগুলি আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। বাস্তবিক ব্যুত্থান-অবস্থায় সর্ব্বক্ষণ নিজের স্বরূপে সুস্থিত থাকা অসম্ভব। যিশুখৃষ্ট ও চৈতন্যদেবের জীবনীর আলোচনা করিলে একথা প্রমাণিত হয়। তাঁহারা কখনও বলিতেন— "মুঁই সেই মুঁই সেই নিত্য নিরঞ্জন"—"I and my Father are One"; আবার কখনও অদর্শনে অস্থির হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিয়া মাটিতে মাথা কুটিতেন। এক কথায় ব্যুত্থানে যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ'।

স্বামীজির একটি প্রধান উপদেশের বিষয় ছিল—'বুঝ্' ও 'অবুঝ্'। এই সকল পত্রে এই 'বুঝ্' ও 'অবুঝের' অনেক কথাই আছে। "বুঝ অভাব না হইলে যখন বুঝাবুঝি ঘোচেনা, তখন বুঝ্ থাকিতে বোধ্য বস্তুর অভাব হইবেনা।" "বুঝা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অতীত অবস্থায় না যাওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতি বর্ত্তমান ও প্রকৃতি অনুরূপ বুঝাবুঝিও বর্ত্তমান"। ইহা সেই উপনিষদের প্রাচীন কথা— "যস্যামতম্ তস্যমতং মতং যস্য ন বেদ সঃ"। বুদ্ধির পক্ষে ইহা প্রহেলিকা কিন্তু বোধির ইহাই চরম পরম।

সাধন সম্পর্কে এই সকল পত্রে অনেক নিগূঢ় কথা আছে— এবং ষট্চক্র ও কুণ্ডলিনী জাগরণ সম্বন্ধেও স্থানে স্থানে ইঙ্গিত আছে। অধিকারী পাঠক তাহা লক্ষ্য

করিবেন। কিন্তু স্বামীজির মতে সাধন পথের প্রধান সম্বল—যিনি রসোবৈ সঃ— সেই 'স'র উপর পরাভক্তি। এইজন্য তিনি নানাভাবে শিষ্যদিগকে সেই 'দিনান বন্ধু অনাথ বন্ধুর করুণা' লাভের উপায় অন্বেষণ করিতে বলিয়াছেন। সেজন্য সদ্‌গুরুর সাহায্য আবশ্যক। "তাহার একমাত্র উপায় 'গুরু'— যাহার কোন অবস্থায় পরিবর্ত্তন হয় না—যাহাতে সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাই অবর্ত্তমান"। তাই স্বামীজি বলিতেন—'ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্'—গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেবো· মহেশ্বর।

"দয়াল গুরু-ধন তারে কি নাগাল পাব, কবে রাঙ্গা পায়ের নুপুর হয়ে আমি চরণে বাজিব"? অবশ্য এগুরু সদ্‌গুরু—সিদ্ধগুরু—যিনি ভাবাতীত ত্রিগুণারহিত, ব্রহ্মানন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত। নহিলে শিষ্যের পদে পদে বিঘ্ন-বিপত্তির সম্ভাবনা।

পত্রাবলীর সম্পাদন সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিতে চাই। পত্রগুলি তারিখ অনুযায়ী না সাজাইয়া বিষয় অনুযায়ী গ্রথিত হইলে ভাল হয়। সম্পাদক ব্যক্তিগত অংশ কতক কতক বাদ দিয়াছেন—কিন্তু আরও বাদ দেওয়া যাইতে পারে এবং সংগৃহীত পত্রাবলীতে যে সকল পুনরুক্তি আছে তাহাও পরিত্যক্ত হইতে পারে। যিনি স্বামীজির শিষ্য নহেন এরূপ পাঠকের সুবিধার জন্য স্থানে

স্থানে দুর্ব্বোধ্য অংশে foot note যোগ করা উচিত। আশা করি পত্রাবলীর অন্যান্য খণ্ডে সম্পাদক এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

(২)

শ্রদ্ধেয় বন্ধু গৌরীশঙ্কর বাবু এই পত্রাবলীর ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়া আমাকে যেমন অনুগৃহীত করেছেন, তেমনি বিপদাপন্ন করেছেন। পত্রগুলি স্বামী পূর্ণানন্দের—তাঁহার প্রতিভাশালী শিষ্যদিগকে লিখেছিলেন। বিষয় প্রধানতঃ যোগ সাধনা ও ব্রহ্মানুভূতি। বিষয় এত গভীর যে, ইহার সম্বন্ধে আমার লিখিবার কোন যোগ্যতা নাই।

পুস্তকখানি পড়িলে ভারতের অন্তর্ম্মুখী সাধনার সহিত পরিচিত হওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের সাধনা ছিল যোগ, সিদ্ধি ছিল ব্রাহ্মীস্থিতি। বর্ত্তমান যুগেও ভারতের সাধক সম্প্রদায়ে এখনও এই সাধনার প্রবর্ত্তন আছে দেখিলে আনন্দ হয়। ব্রহ্ম সাধনা শুধু বিচারেই এই দেশে পর্য্যবসিত হয়নি। ইহার ভিতর যোগানুশাসনের দ্বারা চিত্তকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া ব্রহ্মে লীন করিবার কথা আছে।

পূণ্য-স্মৃতি স্বামীজির যোগের একটা বৈশিষ্ট আছে—দেশে সাধারণতঃ প্রচলিত যোগ প্রণালীর উদ্দেশ্য এক হইলেও সম্প্রদায় বিশেষে সাধনার বিভিন্নতা আছে। স্বামীজির পত্রাবলীতে তাঁহার সাধনার ইঙ্গিত আছে—প্রাণের রশ্মিকে অবলম্বন করিয়া চিত্তকে ব্রহ্মাভিমুখী করিয়া ব্রহ্মেতেই স্থিতি লাভ করা। প্রাণের গতির সহিত শব্দের সম্বন্ধ আছে। শব্দ ও স্বরের দ্বারা কিরূপে প্রাণের নিগমন হয়—এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আছে। ইহা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি ফলদায়ক।

আজকালকার দিনে অধ্যাত্মমার্গের কথা কেহ বড় চিন্তা করেন না—করিলেও দার্শনিক কৌতূহলকে অবলম্বন করিয়া করেন—এবং তথাকথিত দার্শনিকের বুদ্ধির নিয়মিত প্রথাকে অতিক্রম করিলেই তখনই তাহা ত্যাগ করেন। কারণ অনেক সময় দর্শন হয় একটা বিলাসের বস্তু; কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন অবস্থা বিশেষে স্থিতিলাভ করিবার জন্য কোন চেষ্টাই বড় পরিলক্ষিত হয় না। ভারতের দর্শনের এরূপ পরিণতি কখনই হয়নি। বিচারের সহিত তাহার অধ্যাত্ম কৌশল এমনি ছিল যে, স্থিত-প্রজ্ঞ অবস্থা ছিল তাহার সাধনার লক্ষ্য। যোগ কর্ম্মেরই কুশলতা।

গতি ও স্থিতি লইয়াই আমাদের জীবন। ভারতের সাধনার দৃষ্টি স্থিতিতেই নিবদ্ধ। স্থিতিতেই মানুষ পায়

তাহার ব্রহ্মরূপের পরিচয়। এই জন্যই সাধক সম্প্রদায়ে গতিকে খর্ব্ব করিয়া ক্রমশঃ স্থিতিতে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পান। কিরূপে ইহা হতে পারে এবং কত সহজে, তাহার কথা এই পুস্তকে আছে। আমাদের চেতনা সাধারণতঃ ব্যবহারের সংস্কার ও বোধের ভিতর আবদ্ধ— যোগ সাধনা ক্রমশঃ গতির হ্রাস ও সংস্কারের মূল বিনাশ করিয়া—উন্মুক্ত উদার অখণ্ড চেতনার স্বারূপ্যে কিরূপে উন্নীত করিবে, তাহার বিষয় বিশদ্‌রূপে চর্চ্চা এই পুস্তকে আছে।

যখন ভারতের ব্রহ্ম সাধনার প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, তখন এইরূপ পুস্তকের প্রচারের আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী। নিম্নগতি আকর্ষণকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করিয়া— উর্দ্ধগতিকে বৃদ্ধি করিয়া মানুষ যে অপার্থিব সম্পদ পেতে পারে, তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই পুস্তকালোচনা পাঠককে অনেক ভাবিবার বিষয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেবে—এবং তাহার সহিত দেবে অধ্যাত্ম প্রসাদ। ইতি—

শ্রীমহেন্দ্র নাথ সরকার।

পরমহংস পূর্ণানন্দ স্বামীর

সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত।

নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত পূর্ণানন্দ স্বামীর জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতি মাদারিপুর মহাকুমাস্থ মালিগ্রাম। বঙ্গাব্দ ১২৪১, ১৮শে ভাদ্র তারিখে, এক সমৃদ্ধ কায়স্থ-কুলে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতা কবিরাজ সোনারাম দাস মহাশয় একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। সোনারাম এক সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে এই পুত্ররত্ন লাভ করেন। বসন্ত কুমার ইঁহার পিতৃদত্ত নাম। সন্ন্যাসী তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, জাতক জনৈক মহাপুরুষ হইবেন, কিন্তু তিনি গৃহে থাকিবেন না। এজন্য স্নেহশীল পিতা, পুত্রের মনস্তুষ্টি সাধন জন্য বাল্যে নানা আয়োজন করিয়াছিলেন। এমন কি যৌবন সীমায় উপনীত না হইতেই সংসারে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বসন্ত কুমার পিতার অতিশয় আদুরে সন্তান ছিলেন। আদুরে ছেলের প্রকৃতিতে সচরাচর যে একগুঁয়েমি দেখা যায়, বসন্ত কুমারের বাল্য প্রকৃতি তদ্রূপই ছিল; কিন্তু উত্তর কালে সেই একগুয়েমি দৃঢ় সাধুসংকল্পতায় পরিণত হইয়াছিল। দুরন্ত, নির্ভীক প্রকৃতি বসন্ত কুমার বাল্যকালে পাড়ার বালকবৃন্দের দলপতিরূপে প্রতিবাসীগণের মনে সর্ব্বদা অশান্তির সৃষ্টি করিতেন; কিন্তু বিদ্যালয়ে তিনি মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি

বালকরূপে পরিচিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বসন্ত কুমারের দেবতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল এবং রামায়ণ পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। বালক বসন্ত কুমারের কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। তিনি যখন গান করিতে করিতে—"নিদান কালের বন্ধু"—ভগবানকে ডাকিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, তখন উহা আত্মীয়-স্বজন সকলের নিকট এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ছিল। তিনি যেমন সঙ্গীত-প্রিয় তেমন রচনা পটুও ছিলেন। ছাত্র-জীবনে অনেক সময় যাত্রা ও কবির দলের দলপতিগণের সাহায্যার্থ গান রচনা করিয়া দিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাব-কবি ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনের তাঁহার রচিত সাধন-সঙ্গীতগুলি যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী।

বসন্ত কুমার ৯বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া ১৬ বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ঢাকা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এবং তথা হইতে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা পাশ করিয়া সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর কিছুদিন ওকালতি পড়িয়া, দেড় বৎসর কাল চরকালকিনীতে জরিপ আমীনের কার্য্য করেন। ইহার পর অত্যল্পকাল পুলিশের কার্য্য করিয়া তিনি রাজসাহী লোকনাথ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করেন। রাজসাহীর কর্ম্মক্ষেত্রেই তাঁহার জীবনের

প্রত্যাবর্ত্তন কেন্দ্র। বিষয় লক্ষ্যে আসিয়া তাঁহাকে এই স্থানে বিষয় ত্যাগী হইতে হইয়াছিল।

রাজসাহীতে পণ্ডিতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে একদিন তাঁহার সঙ্গে এক ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী সুমধুর কণ্ঠে যখন গাহিতেছিলেন,—"যিনি তোমার অন্তরে—তা'হতে কত অন্তর হ'তেছ"—সঙ্গীতের এই ভাবটি বসন্ত কুমারের মর্ম্মস্থল এরূপ স্পর্শ করিল যে, ব্যাকুল ভাবে সন্ন্যাসী ঠাকুরের শরণাপত্তি প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দিলেন।

বসন্ত কুমারের বৈরাগ্যভাব এতই প্রবল হইল যে, যৌবনের ভোগ লালসা, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন, পিতা মাতার ভালবাসা,সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তিনি গৃহ ত্যাগ করিলেন। বসন্ত কুমার বহু ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় করিয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান অনুসন্ধানের পর,সুন্দরবনের এক পর্ণ-কুটিরে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎলাভ করেন।

স্বামীজি তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াও মনস্কাম সিদ্ধির উপায় স্বরূপ হিমালয়স্থ সিদ্ধাশ্রমের সন্ধান বলিয়া দেন। অতঃপর বসন্ত কুমার বাটী ফিরিয়া আসিয়া কোনরূপে পাথেয় সংগ্রহ করতঃ স্বামীজির নির্দ্দেশমত সিদ্ধাশ্রমের পথে রওনা হইলেন।

পথিমধ্যে দার্জ্জিলিং সহরে নদীয়া জেলাস্থ মুড়াপাড়া নিবাসী প্রমথ নাথ ওরফে পশুপতি নাথ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক সংসার বিরক্ত পর্য্যটকের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুতা জন্মে এবং সিদ্ধাশ্রম যাইতে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। অতঃপর উভয়ে পিঞ্জর-মুক্ত কেশরীর ন্যায় অকুতোভয়ে পার্ব্বত্য-পথের বাধা-বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের অপর পার্শ্বে, লামাবাজার নামক স্থানে পৌঁছাইয়া সিদ্ধাশ্রম যোগীগণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বহু যাত্রী জুটিল, যথা সময়ে যোগীগণ অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু তাঁহারা কাহাকেও সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না; নিষেধ সত্ত্বেও যাত্রীগণ যোগীগণের পশ্চাদনুসরণ করিলেন, কিন্তু পার্ব্বত্য-পথের দুর্গমতা দেখিয়া অনেকেই পশ্চাৎপদ হইলেন। বসন্ত কুমার ও প্রমথ নাথ যোগীগণের লগুড় তাড়না সহ্য করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। পাঁচ দিন পথ চলিবার পর তাঁহারা মন্দাকিণী তটে পৌছিলেন। মন্দাকিণীর অপর পারেই সিদ্ধাশ্রম। বসন্ত কুমার সেই আশ্রম বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক সময়ই বলিতেন,—"স্বভাবের সেই সুচারু-দৃশ্য কালীদাসের অত্যুক্তিপূর্ণ বর্ণনাকেও যেন তিরস্কার করিয়া থাকে"।

বসন্ত কুমারের দেহ মন নিষ্কলঙ্ক; প্রাণ তত্ত্ব সাক্ষাৎ-কারের জন্য ব্যাকুল; আশ্রম-গুরু মহর্ষি মাতঙ্গ ইহা

বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি অচিরেই কৃপা করিলেন। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২৮শে মাঘ বসন্ত কুমারের দীক্ষালাভ হইল। অষ্টাঙ্গ যোগ তাঁহার বিশেষ সাধনার বিষয় ছিল। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই তিনি যোগ সিদ্ধ হইয়া পরমহংসাখ্য-জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। এই সময় তিনি 'ক্রিয়াময়' জগৎ ও দেহ-জ্ঞান হইতে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া আত্ম-স্বরূপের অবস্থায় একাধিক্রমে ৪৫ দিন সমাধিস্থ ছিলেন। আশ্রম-গুরু অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাকে 'পূর্ণানন্দ' নাম প্রদান করেন। প্রমথ নাথও আশ্রম-গুরুর কৃপায় পঞ্চতত্ত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া 'সর্ব্বানন্দ' নাম প্রাপ্ত হন।

এই দৃশ্যমান জগৎ বা জ্ঞানের বিষয় স্বতঃসিদ্ধ ভ্রান্তি—ইহাই পূর্ণানন্দের জ্ঞানের আকার হইয়া পড়িল; সুতরাং এই জাগতিক ব্যাপার ও দৈহিক ক্রিয়াতে তাঁহার আসক্তির হেতু রহিল না। তাঁহার প্রাণ ভূমানন্দে পরিপূর্ণ। এইরূপ অনাসক্ত জীবন্মুক্তাবস্থায় মহাপুরুষ পূর্ণানন্দ সিদ্ধাশ্রমে মহাজন সহবাসে পাঁচ বৎসর কাল ছিলেন। একদিন হঠাৎ আশ্রম-গুরু, পূর্ণানন্দ ও সর্ব্বানন্দকে স্নেহভরে ডাকিয়া ভারতের কল্যাণ সাধনার্থ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গুরুর আদেশ পালনে সিদ্ধদ্বয় সিদ্ধাশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

সিদ্ধাশ্রম হইতে স্বামীদ্বয় কাশ্মীর ও নেপাল হইয়া কুরুক্ষেত্রে আগমন করেন এবং তথায় এক যোগাশ্রম স্থাপন করেন। বনমালী ওরফে 'বম্‌ভোলা' নামে জনৈক প্রবাসী বাঙ্গালী, পূর্ণানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আশ্রমের পরিচর্য্যাভার গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্রে পূর্ণানন্দের প্রথম শিষ্য হইয়াছিলেন বিশ্বম্ভর গিরি নামক জনৈক কনৌজি ব্রাহ্মণ। কয়েক বৎসর মধ্যে অপর কোন উপযুক্ত শিষ্য না পাওয়ায় স্বামীদ্বয়ের মধ্যে কেহ না কেহ উত্তর ভারতে নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া উপযুক্ত অধিকারীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত রহিলেন। এইসময় কিছুকাল অবধি কাশীধাম হইতে প্রকাশিত 'বেদব্যাস' পত্রিকায় পূর্ণানন্দ স্বামীর যোগৈশ্চর্য্য পরিচায়ক বিবিধ অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায়, নানাস্থান হইতে কৌতূহল পরায়ণ লোক আসিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতে লাগিল। এইসব কারণে এবং আর কোন উপযুক্ত অধিকারী শিষ্য না পাওয়ায় স্বামীজি কুরুক্ষেত্র পরিত্যাগ করাই স্থির করিলেন; সর্ব্বানন্দ স্বামীও স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। এইসময় আশ্রম পরিচারক ভক্ত 'বম্‌ভোলা' হঠাৎ বিসূচিকা রোগে প্রাণ ত্যাগ করায় পূর্ণানন্দ স্বামী ভক্তবৃন্দকে জানাইলেন তিনিও দেহরক্ষা করিবেন। স্বামীজি কোন যৌগিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া মৃতবৎ হন। তাঁহার মৃতবৎ দেহটি ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কারণ দাহ করা

হইবে না ইহা তাঁহার আদেশ ছিল। অতঃপর স্বামীজি ছদ্মবেশে এক গ্রামে গিয়া উঠিলেন। এদিকে 'বেদব্যাস' পত্রিকায় প্রচারিত হইল যোগী পূর্ণানন্দ দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। 'বেদব্যাস' পত্রিকার ১১৯৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় "স্বর্গীয় পূর্ণানন্দ স্বামী" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে স্বামীজির যোগৈশ্চর্য্যের অনেক কথা পাওয়া যায়। কৌতূহলী পাঠক উহা পাঠ করিতে পারেন।

তাঁহার একটি সঙ্গীতে দেখা যায়,—"বাহ্যযোগে ধরবেরে ঐশ্বর্য্য রোগে, পুনঃ আন্‌বে কর্ম্ম ভোগে, থাক তাঁর যোগে, মন তাঁরে দেখে।" পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্যে ও মান-সম্ভ্রমের প্রতি তিনি যেরূপ বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, যোগৈশ্চর্য্যের প্রতিও সেইরূপ ছিলেন। স্পন্দনাত্মক জ্ঞানের কার্য্যকে পূর্ণানন্দ ভেলকীবাজী মনে করিতেন। পরবর্ত্তী আশ্রম-জীবনে তিনি কখনও যোগৈশ্চর্য্যের প্রতি কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; বরং অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"এগুলি বাঁদ্‌রামি, এগুলির সহিত পরম তত্ত্বের কোন সংশ্রব নাই।"

কুরুক্ষেত্র হইতে স্বামীজি বঙ্গদেশে আসিয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া উপযুক্ত শিষ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময় সুসঙ্গ রাজ বাড়ীতে চন্দন-রেণু নির্ম্মিত শিব স্থাপন তাঁহার এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। যাহা-

হউক অধিকারী শিষ্য না পাওয়ায় সচ্ছিষ্য কামনায় কিছুকাল তিনি গৃহীভাবে ভোলায় অবস্থান করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনস্কাম পূর্ণ হইল না দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। পরে দক্ষিণ ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে যান এবং তথা হইতে চট্টগ্রাম হইয়া ত্রিপুরা জেলায় আগমন করেন। এই সময় দয়াপরবশ হইয়া জনৈক গলিত কুষ্ঠ রোগী এবং উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ বহু রোগীকে নিরাময় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন; এবং এই সময় হইতেই শিষ্য গ্রহণ-প্রণালী ও শিষ্য অধিকার বিষয়ে পূর্ব্বাচরিত আদর্শের কথঞ্চিৎ শিথিলতা করেন। অতঃপর দারোরা নামক স্থানে চন্দ্রনাথ সেন ও তাঁহার পত্নী রাজকুমারী দেবীকে প্রথম শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। তৎপরে বঙ্গচন্দ্র দে, মনোমোহন বসু ও তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনী দেবী, ব্যারিষ্টার পি, মিত্র, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বাসন্তী দেবী, রাম উত্তম ঘোষ, কেশবানন্দ মহাভারতী পাগল বাবা (যশোহর বিনোদপুরস্থ "বসন্ত যোগাশ্রম" প্রতিষ্ঠাতা) প্রভৃতি অনেককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন।

পূর্ণানন্দ বলিতেন,—"প্রকৃত সাধন-স্পৃহা লইয়া জীব জগতে না আসিলে পুনরায় ভারত উদ্ধার হইবে না। লোভ ও কামের বশবর্ত্তী জীব দ্বারা উৎপন্ন সন্তান, লোভ ও কামেরই বশবর্ত্তী হইবে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম।" এজন্য

ভারতে সর্ব্ব প্রথম জননী-শক্তির পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে বালক বালিকাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলে কার্য্যকরী হইবে বলিয়া, চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় ষোল মাইল দূরে এক পাহাড়ে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৩রা বৈশাখ, "জগৎপুর আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎ সংলগ্ন একটি সংস্কৃত টোলও স্থাপিত হয়। এই জগৎপুর আশ্রম এবং পরবর্ত্তীকালে কামাখ্যা "কালীপুর আশ্রম" ও অন্যান্য শাখা আশ্রম স্থাপন কালে শিষ্য-প্রশিষ্য ব্যতীত স্বামীজি অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহার দৃঢ় অপরিগ্রহ নিষ্ঠা দৃষ্ট হয়। উক্ত জগৎপুর আশ্রমে যখন নারীগণের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বাংলাদেশে কেহই দেশীয় আবহাওয়ার মধ্যে দেশীয় প্রণালীতে নারীর উচ্চ শিক্ষার কল্পনাও করেন নাই। স্বামীজিই বাংলা দেশে এরূপ শিক্ষা প্রচলনের প্রথম প্রদর্শক। এই আশ্রম হইতে শ্রীমতী বাসন্তী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থা, শ্রীমতী যোগেশ্বরী সরস্বতী, শ্রীমতী প্রতিভা সাংখ্য-শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু ছাত্রী এবং বহু ছাত্র কৃতিত্বের সহিত উপাধি পরীক্ষায় পাশ করিয়া জগৎপুর আশ্রমস্থ টোলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। টোলটি অদ্যাপি পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেছে। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লাট সাহেব

মহামান্য লর্ড কারমাইকেল মহোদয় ও তদীয় পত্নী,চট্টগ্রাম ডিভিসানের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মাননীয় মিঃ কে, সি, দে মহোদয় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য বক্তি আশ্রম ও আশ্রমস্থ বালক বালিকাদিগকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়া সাফল্য কামনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে, টি, মহোদয় বার্ষিক সংস্কৃত কন্‌ভোকেসানে আশ্রমস্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদিগকে প্রাচীন কালের লীলা, গার্গী প্রভৃতির সহিত তুলনা করিয়া উচ্চ প্রশংসা করিতেন। আশ্রমস্থ বহু ছাত্র এম্‌-এ, বি-এও, পাশ করিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে অনেকে শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে নিয়োজিত আছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় স্বামীজি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না।

যাহা হউক পূর্ণানন্দ তাঁহার শিষ্যবর্গকে আত্ম-স্বরূপ লাভের অভিনব সরল উপায় যাহা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপমা বর্ত্তমান ভারতে অতি দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বর্ত্তমান জীব সতত অশান্তি ভোগ করতঃ হাহাকার করিতেছে, সেই লক্ষ্য বা গুরু ধরাইয়া দিয়া অসহায় জীবকে শান্তি দান করা ছিল, তাঁহার জীবনব্যাপী একমাত্র কার্য্য। এই কার্য্যই তাঁহার সিদ্ধাশ্রমের গুরু দক্ষিণা বলিয়া মনে হয়।

পূর্ণানন্দের বিশ্ব-মৈত্রীর পরিচয় তাঁহার আশ্রম-জীবনে

পাওয়া যায়। তাঁহার আশ্রম-দ্বার জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের নিকটই উন্মুক্ত ছিল। আগন্তুক ও অতিথিগণ সকলেই তাঁহার আদর অভ্যর্থনা ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। আশ্রম-জীবনে তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ গৃহীর মত ছিল। তিনি বলিতেন,—“বিষয় ও বিষয়ী সংশ্রবে থাকিয়া সাধুর বেশ পরিধান করা কপটাচার।” মিথ্যা ও কপটাচারকে পূর্ণানন্দ আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। সাধারণ লোকের সহিত স্বামীজি যেরূপ প্রাণখোলা ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাহাতে তিনি যে একজন তত্ত্ব-জ্ঞানী মহাপুরুষ,তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। ধর্ম্ম সম্পর্কের নাতি-নাত্নি ও প্রশিষ্যদের সহিত বৃদ্ধ স্বামীজির বালক-স্বভাব-সুলভ হাস্য-কৌতুকাদি সাধারণে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে যেন বালক বলিয়াই মনে করিতেন। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, যে কোন ব্যক্তি যে কোন কারণেই হউক ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন, তিনিই আনন্দ পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অতি প্রিয় ভক্ত ব্যতীত তাঁহাকে আসলে চিনিবার মত লোক অতি বিরল ছিল। আমরা অনেক স্থলেই পরিচয় পাইয়াছি, বৃন্দাবনের পূজ্যপাদ রামদাস কাঠিয়া বাবা (ব্রজবিদেহী ৺সন্তদাস বাবাজী মহাশয়ের গুরু), মুর্শিদাবাদের জলদ বাবাজী এবং সন্দীপের কাশিমসাহ ফকির স্বামীজির অন্তরঙ্গ

বন্ধু ছিলেন। মহাপুরুষগণ কে কি ভাবে জীবের দুঃখ মোচন করিতে জগতে আবির্ভূত হন, তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়!

দীর্ঘকাল জগৎপুর আশ্রমে থাকিয়া স্বামীজির স্বাস্থ্য-ভগ্ন হওয়ায় শিষ্য-প্রশিষ্যদিগকে পূর্ব্বেই জানাইয়া ছিলেন, শীঘ্রই তিনি দেহরক্ষা করিবেন। সকলেই এ সংবাদে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন শিষ্য-প্রশিষ্যদের সহিত মহানন্দে কাটাইয়া জগৎপুর আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। তৎপরে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ, সোমবার ব্রাহ্ম মুহুর্ত্তে, আশ্রমস্থ শিষ্যবৃন্দকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমবেত কণ্ঠোত্থিত গুরু-ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ণানন্দ ঐ ধ্বনিতে লীন হইয়া গেলেন। কামাখ্যা শাখা আশ্রম স্থাপন কালে তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি যেখানেই থাকি না কেন, জগৎপুরে দেহ রক্ষা করিব"। মহাপুরুষের সেই বাক্য সিদ্ধ হইল। ঠাকুর পূর্ণানন্দের স্বরূপ অবস্থা কয়জন বুঝিয়াছেন জানি না। তিনি একস্থানে বলিয়াছিলেন,— **"আমার স্বরূপাবস্থা গুরু-গুরু করিয়া বুঝা ভিন্ন অন্য উপায় নাই"।**

সম্প্রতি জগৎপুর আশ্রমে **শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধির** উপর একটি মনোরম মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

পরমহংস
পূর্ণানন্দ স্বামীর
পত্রাবলী।

[প্রথম খণ্ড]

বঙ্গাব্দ—১২-৭-.৭]　　(১)　　[প—প্র

প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব প্রকৃতির অনুকূলে যে সব কর্ম্ম করে, তাহাতে প্রকৃতির পূর্ণমাত্রায় সাহায্য পায়; কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলে বা বিপক্ষে যাইতে হইলে প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিরোধী হয়। বিশেষতঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোথায় যাইব, কেন যাইব, কা'র কাছে যাইব, কিজন্য যাইব—প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব কিছুই বুঝেনা; প্রকৃতির খর্ব্ব না হইলে বুঝিতেও পারেনা। এ অবস্থায় প্রকৃতির বিপরীত ধর্ম্ম একটা কথার কথা মাত্র; সুতরাং সে কথায় লোকে কেন যাইবে? এজন্য প্রকৃতির বিপরীত ধর্ম্ম সংসারে বিলুপ্ত প্রায়। আমার এ-কথা বর্ত্তমান যুগে বিক্রয় হইবে না, ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। তবে প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম্ম যাহা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী, তাহাই বর্ত্তমান যুগের পক্ষে যুক্তিযুক্ত।······প্রকৃতির

কার্য্যে বৈরাগ্য না জন্মিলে—আমার এ-সাধনে অধিকার জন্মে না।

সময় সময় আমার সঙ্গে দেখা না হইলে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। আমার সঙ্গে দেখা হইলে—অন্ততঃ একটা "গুরু-গুরু" টানাটানি থাকিলেও আংশিক কতকটা কার্য্য হয়। যাহাহউক সর্ব্বদা যে কোন প্রকারেই হউক একটা না একটা যে কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধ লইয়া থাকিলেও পরজন্মে মানব-দেহ পাওয়ার আশা থাকে।

বঙ্গাব্দ—২২-৩-১৮] (২) [সু

সংসারে বাসনাই মানুষকে বিষের জ্বালায় দগ্ধ করিতেছে। মানুষ সংসারে অমরত্ব লাভ করিতে চাহিলে ঐ গরল-দাত্রী কুহকিনীকে ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়ে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমার কিছু চাওয়ার নাই, আমার কিছু পাওয়ার নাই—কেবল এক নিদান-বন্ধু অনাথ-বন্ধুর করুণাই আমার বাসনার বিষয়—যতদিন আমার এ অবস্থা ছিল—ততদিন সংসারকে যে কি অতুলনীয় আনন্দ-ধাম মনে করিতাম, তাহা তোমাকে কি দিয়া বুঝাইব?—এমন কোন শব্দই পাই না।

যে দিন আমার সেই প্রাণের প্রাণ জগৎ-প্রাণের স্থানে 'রাজকুমারী-চন্দ্রনাথকে' স্থান দিলাম, সেই দিন হইতে আমি যেন কোন্ উপমা-রহিত অপূর্ব্ব আনন্দ-ধাম হইতে স্খলিত হইয়া, প্রবল দাবাগ্নির মধ্যে পড়িয়া যাতনায় ধড়্‌ফড়্ করিতে লাগিলাম ও ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিলাম। কোথায় ছিলাম—সে স্থানের স্মৃতি যেন ক্রমে ক্রমে আমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। মা'র অভাবের পর ক্রমে আবার সেই শান্তি-স্থানের স্মৃতি বিদ্যুদ্‌বৎ ক্ষণে ক্ষণে আমার প্রাণে জাগিতে লাগিল। হঠাৎ 'বিশ্বনাথ'-প্রবল বায়ু আসিয়া আমার হতাশা-মেঘ উড়িয়া যাওয়ায় সেই বিদ্যুৎ আর এক দিনের জন্যও আমার চক্ষুগোচর হয় নাই। ইতি-মধ্যে এক দিন অতি দূরে—সেই বিদ্যুদাভা একটু মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম, যে দিন পরীক্ষার ফলের সংবাদের পর ক্ষণকালের জন্য 'বিশ্বনাথ'-প্রবল বায়ু ঈষৎ মন্দীভূত হইয়াছিল। দুর্ভাগার দুর্ভাগ্য-ক্রমে আবার সেই প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। আমার নৈরাশ্য-মেঘের ঈষৎ ঈষৎ তারল্যের মধ্য দিয়া যে ক্ষণ-প্রভার ঈষৎ প্রভা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। এখন কেবল হা হতোঽস্মি পরিপূর্ণ হৃদয়ে প্রবল বাসনা-অনলে দগ্ধ হইতেছি। অন্তিমে অন্তকারীর চিন্তা

আমার অন্তরে ক্ষণকালের জন্যও স্থান পায় নাই। আজ আবার সেই মহিষ-বাহন করাল-বদন ভীষণ দণ্ডধারী আকার মুহুর্মুহু দেখিতেছি; কারণ—শেষ দিন পর্য্যন্ত আমর অন্তর অধিকার করিয়া—পাছেবা এই জগৎ অন্তকারীর হস্তে আমাকে সমর্পন করে। সেই শমন-দমন ভবতারণ চরণ যে আমার স্মরণে আসে, মনে হয় না।

বঙ্গাব্দ—২৯-৩-১৮] (৩) [স্থ

* * কেবল সাংসারিক আলাপেই অদ্যকার চিঠি শেষ করিলাম। তোমার নিকট আমার শেষ জিজ্ঞাস্য এই যে—এমন মানুষ কি এ সংসারে সম্ভবপর নয় যে, সর্ব্ব প্রাণী যেরূপ স্ত্রী পুত্র নিয়া সংসার করে, তাহা না করিয়া থাকিতে পারে? আত্ম-সুখ ভুলিয়া জগতের হিতের জন্যই যশোলিপ্সা পরিশূন্য হইয়া কার্য্য করিতে পারে? শরীর রক্ষণোপযোগী আহার-ব্যবহার ভিন্ন অন্য আহার-ব্যবহার বর্জ্জন করিতে পারে? এরূপ মানুষ সম্ভব কিনা? যদি অসম্ভবই হয়, তবে আর এ-পণ্ডশ্রমে ফল কি? আমি সেইরূপ মানুষ নই; আমি যেরূপ মানুষ তা'র জন্য তেমন। তোমরা এ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিলে আমার আশা পূর্ণ হইবে না। * *

বঙ্গাব্দ—২-৪-১৮] (৪) [স্ব

পিতৃ-মাতৃ রজোবীর্য্য একত্র হইবার পর, যখন আমরা মাতৃ জরায়ুতে ক্ষুদ্র একটি অণ্ডাকারে অবস্থান করি, তখন সেই অণ্ডটির ভিতরে আমাদের সর্ব্বাবয়ব ও অবয়বানুরূপ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সমস্ত গুলি অবস্থান করে। ক্রমে বাহ্য-জগতের সহিত ঐ অণ্ডের সংযোগ-বিয়োগে সমস্ত অবয়ব ও প্রবৃত্তি গুলির বিকাশ হয়। আমরা সেই অবয়ব ও প্রবৃত্তি অনুরূপ ব্যবহারকে ভালবাসি এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি। যে কারণ ঐ গর্ভস্থ অণ্ডের মধ্যে অবস্থান করিয়া, আমাদের এই হস্ত-পদ-নখ-চোখ-বিশিষ্ট অবয়ব ও অবয়বানুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে, তৎ-কারণের অভাব না হইলে, আমাদের অবয়বের ও অবয়বানুরূপ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। ঋষিরা বহু চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া নিবৃত্তির জন্য কেবল মাত্র "গুরু" শব্দই প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছেন। কারণ, "গুরু" এই শব্দস্থিত "উ"-কার ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারণ না করিয়া, যদি উহা ভ্রূ-মধ্যস্থিত "হুঁ"-এর "উ"-কারের সহিত মিলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই বাহ্য জগতের ও বাহ্য অবয়বের কোনও অংশের জ্ঞান থাকে না। কোনও অংশের জ্ঞান থাকিতে, গুরু-শব্দের "উ", "হুঁ"-এর "উ"-কারের সঙ্গে না মিলিয়া ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত হইতে থাকে। ইহাতে

সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে,- যদ্দারা বাহ্য জগতের জ্ঞানের অভাব হয়, তৎ উপায় ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা এই অবয়ব বা বাহ্য জগতের জ্ঞান যৎ কারণে উৎপন্ন হয়, তৎ ক্রিয়ার অভাব হইতে পারেনা। আবার সেই "হুঁ"-এর "উ"-এর সঙ্গে "গুরু" শব্দের "উ"-কার মিলাইয়া দিবার জন্য "হুঁ"-এর "হ-"কারের খর্ব্বতা আবশ্যক এবং তজ্জন্যই "মূল-মন্ত্র"।* সেই "মূল-মন্ত্র" পূর্ণশক্তি দ্বারা করিবার জন্য "গুরু-বীজ"। মানুষ ঋষিদের প্রদর্শিত পথে ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের সহিত না চলিলে, যৎ হেতুতে এই মাতৃ জরায়ুস্থ অণ্ড হইতে বৃহদাকার শরীর ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অভাব করিতে পারে না।

আমাদের মনোবৃত্তির যে বৃত্তি-অনুরূপ যে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ বাক্য,হস্ত-পদাদি চালন, দর্শন,স্পর্শন, আহার ও বিহার সব ক্রিয়াই হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কোনও মনোবৃত্তির অনুরূপ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আস্বাদন ও বাক্য প্রভৃতির কোন একটা থাকিলে, ঐ মনোবৃত্তির ক্রিয়াটিও বর্ত্তমান থাকে। বরং

---

* ঠাকুর পূর্ণানন্দ স্বামীর সন্ন্যাসী শিষ্য-নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ স্বামী কেশবানন্দ মহাভারতী (পাগলবাবা) মহোদয়ের সমাহিত চিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস—"আনন্দ-গীতা" পাঠ করিবেন।

অন্যান্য ক্রিয়ানুরূপ কার্য্য গুলির অভাব হইলে, যে অংশে ক্রিয়া বিশেষ প্রকাশ থাকে, তদংশে ঐ ক্রিয়ার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয় ; যথা ঃ—পেটুক বা কামুক ব্যক্তির আহার বা কামনার-বিষয়ে বাধা পড়িলে, ভাষাতেই তাহার শক্তিটা পূর্ণ মাত্রায় নিয়োজিত হয়। অতএব আমাদের কোনও বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিতে হইলে, তৎ সম্বন্ধে তৎ ক্রিয়ানুকূল যে যে কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার সমস্ত গুলিকেই নিবৃত্ত রাখা উচিত। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা কামের অঙ্গীয় অষ্টাঙ্গ মৈথুন ব্রহ্মচর্য্যে নিষেধ করিয়াছেন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া-নিষ্পত্তিরেবচ।
এতন্মৈথুন মষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ
বিপরীত ব্রহ্মচর্য্য মেত দেবাষ্ট লক্ষণম্॥"

এই ত গেল কাম সম্বন্ধে। আহারাদির প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই,যে বিষয়ের আনুষঙ্গিক যে যে ব্যাপার, তৎ সঙ্গে বা তৎ কারণে উৎপত্তি যাহা হয়, তাহার সমস্তই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ; নচেৎ নিবৃত্তি অসম্ভব। এজন্য বলিতেছি—যে স্থানে থাকিলে তোমার নিবৃত্তি সাধন পক্ষে বাধা জন্মে,এরূপ স্থানে তোমার থাকা কর্ত্তব্য নহে।

বঙ্গাব্দ—৪-৪-১৮] (৫) [স্থ

এখন প্রবল বৃষ্টি—কর্ণে কিছুমাত্র শোনা যায়না; তাই চিঠিখানায় ভাল কোন সংবাদ লিখা হইল না। ভীষণ দুর্নিবার-স্রোত প্রবল বেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত; এ অবস্থায় সর্ব্বদা—'দ্বিদল' মধ্যে যে একটি 'খুটা' আছে, তাহা ধরিয়া থাকাই একমাত্র উপায়। খুটা ছাড়িয়া দিলে স্রোতে ভাসাইয়া কোথায় নিয়া যাইবে—আমার এই জীর্ণ-শীর্ণ শরীর দিয়া তালাস-অনুসন্ধানে খুঁজিয়া বাহির করা দায় হইবে।

বঙ্গাব্দ—৯-৪-১৮] (৬) [স্থ

যে পশু কেবল নিজকে নিজে নিয়া না থাকিয়া আত্ম-সুখের জন্য অপরের উপর নির্ভর করে, তা'র মত নিরেট্ মূর্খ ও বোকা হতভাগ্য-জগতে আর দুইটি নাই। যে মায়া, অপূর্ব্ব কুহক-জাল বিস্তার করিয়া এই জগৎকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, সেই মায়া কুহকিনীকে যে সাদরে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে, তাহার দুঃখের অভাব কোথায়?

আমি মায়ার মোহিনী-মূর্ত্তিতে ভুলিয়া যে কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিলাম, তাহার অবধি নাই। সেই মায়া-মূর্ত্তির মধ্যে প্রধান মূর্ত্তিটি স্ত্রীরূপ।.........আমার এই বাক্যটি সর্ব্বদাই মনে রাখিবে এবং শঙ্করাচার্য্যের মত ঠাকুরাণীদের পদে নমস্কার দিয়া চলিবে। ভিতরে কিন্তু ঠাকুরাণীদের ঐ বীজ নিহিত আছে; কোন রকমে সূর্য্য কিরণ ও জল সংযোগ হইলেই গজাইবে। কিছুতেই গজাইতে দিবানা। আমি পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—আমি তোমার আছি ও থাকিব; তবুও কি তুমি এই কুহকিনীর মোহ হইতে দূরে থাকিতে পারিবানা? আমাকে পাইয়াও কি তোমার অন্য কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে? একবার পেঁচে পড়িলে, সে পেঁচ কিছুতেই এড়ান যায়না; ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। শেষ এক মহাপুরুষ রাত-দিনই কর্ত্তব্য-জ্ঞান উপদেশ দিবেন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকলের মুখে প্রস্রাব করিতে না পারিলে আর আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবানা।

বঙ্গাব্দ—১০-৪-১৮] (৭) [সু

এইমাত্র বেলা ৩ ঘটিকার কালে তোমার চিঠিখানা পাইলাম। লিখিয়াছ—আগুণ লাগাইয়া দিয়া বাতাস দেওয়া আমার কার্য্য। যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভারতের মহান্ অনিষ্ট সম্পাদিত হইয়াছে এবং যাহার মত নিষ্ঠুর ও নৃশংস ব্যাপার আর কোন কালে কোন দিন আর্য্য-সন্তান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেইরূপ ঘটনায়ও কৃষ্ণ,অর্জ্জুনকে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন—যা'র মূলে এই গীতা-শাস্ত্র। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় প্রকৃতি—সাময়িক মোহবশে বা ভাবান্তর প্রযুক্ত সম্মুখ সমরে নিবৃত্তি আসিলেও, পরে সেই নিবৃত্তি হেতুই তিনি পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইতে পারেন, এই জন্যই তাঁহার সাময়িক নিবৃত্তির অবস্থায়—শ্রীকৃষ্ণ,যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া ছিলেন। তোমার পরীক্ষার ফল শুনিয়া যে প্রকার প্রাণের আবেগ দেখিলাম—তাহাতে পড়ানই উচিত মনে আসিল। এ-ত সাধারণ ভাবের কথা—বিশেষ ভাবে—যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমার এই নিরেট্ ও অজ্ঞান মূর্খের কথাগুলি এ সংসারে সকলে সত্য ও ঠিক মনে করিবে, সেইজন্য যাহার প্রতি ভার অর্পন করিয়া বসিয়া আছি, সে যদি সামান্য কলিকাতায় বিষয়ান্দোলনে আন্দোলিত হয় ও মানুষ-কল্পিত সমস্ত

ভোগ-বিলাসের জিনিসেই তাহার কৃত্রিম কল্পনা হৃদয়ে স্থান পায়, তবে আর আমার আশা কোথায় ? সংসার-মুগ্ধ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে এরূপ শত-সহস্র বা লক্ষ-লক্ষ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে যে, পর-পুরুষগামী স্ত্রী বা পর-স্ত্রীগামী পুরুষ জগতের সমস্ত আবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও, অনন্ত বাধা অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব অভীপ্সিত মানুষের চিন্তা করিয়া থাকে। তুমি এই সামান্য বাধায় যদি গুরুকে ভুলিয়া যাও—তবে ভুলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। শরীরের ক্ষয় বেশী হইলে বেশী আহার আবশ্যক, সেই কথায় যদি তোমার ভয়ের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ভয়ের জন্য আমি দায়ী। ক্ষুধা লাগিলে না খাইয়া শরীর ক্লিষ্ট করা ঘোর অনিষ্টজনক। এই হেতুতে পঞ্চদশী অন্নকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের কারণ লিখিয়াছেন। মোট কথা, কলিকাতা থাকিয়া তোমার পরিবর্ত্তন ঘটে, মঙ্গল। কারণ, তুমি চিরকাল শিশুর মত আমার কোলে চড়িয়া বেড়াইতে চাহিলে চলিবে কেন ? আমার অভাব হইলে ত তুমি প্রতি পদে আছাড় পড়িবে। তোমাকে একটু হাঁটা শিখান আমার উদ্দেশ্য। বাবা—আমি কোলে করিয়া রাখিলে—অনেককেই ধরিয়া রাখিতে পারি ; তাহাতে তোমার আর বিশেষত্ব কি ? এবার তুমি যেন নিজেই পড়া-শুনার জন্য কলিকাতা গিয়াছ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু

আমার মত তা' নয়। তুমি গুরুর আদেশে আদিষ্ট হইয়া আদেশ পালন করিতেছ,ইহা স্থির না থাকিলে গোলযোগ ঘটিবে। আমি এ পর্য্যন্ত এই বুঝিয়াছি—গুরু-বাক্য রক্ষাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। বোধ হয় এই মহামন্ত্রই আমাকে ঠিক রাখিয়াছে, নচেৎ এত দিন স্রোতে ভাসিয়া কোথায় যাইতাম। আমার মতে সংসারের সব কার্য্যই গুরু-বাক্যে করিতেছি—নিজের কোন মতামত নাই—এই উপায়ে চলা ভিন্ন,মানুষ বর্ত্তমান অবস্থায় স্থির থাকিতে পারে না। তুমি কলিকাতাকে এতই ভয় করিতেছ? ইহাতে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম! কলিকাতার স্রোত আমার টানকেও অতিক্রম করিয়া তোমাকে বিপরীত দিকে নিবে, ইহা মনে হইলে, আমার নিজের প্রতি নিজের অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে। যাহাহউক, তুমি সর্ব্বদাই যাহাতে সুস্থ থাকিতে পার, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবা। পূজার বন্ধে সকলে একত্র হইবে, সে সময় তোমার কত দূর পরিবর্ত্তন হয় দেখিয়া, যাহা করিবার করিব।

অদ্য চিঠি পাওয়া মাত্রই উত্তর দিলাম; ইহার পর এক সপ্তাহ অন্তর এক চিঠি লিখিব, তারপর দুই সপ্তাহ অন্তর, তারপর একমাস অন্তর। ইহা দ্বারা পরিবর্ত্তনটা ভালরূপে পরীক্ষা করা হইবে। তুমি যদি কলিকাতাকে

ভয় পাও, তবে আমার উপায় কি? জগতে কত সময়ে কত উৎকট প্রলোভনে পতিত হইতে হয়—যে প্রলোভনে অনেক সময়ে মহর্ষিরাও গড়াগড়ি দিয়াছেন।

বঙ্গাব্দ—১৩-৪-১৮] (৮) [স্থ

বৎস,—তুমিও বিষকে ভয় কর!! তবে আর এ বিষয়-গরল পান করিয়া হজম করিবার লোক আমার তহবিলে নাই। আমি জানিতাম—অহর্নিশ 'গুরু-গুরু' চিন্তায় তোমার প্রবল জঠরাগ্নিতে যাহা কিছু পড়ে, তৎ-সমস্তই ভস্মসাৎ হয়। তুমিও যখন কলিকাতার প্রবল বিলাসিতা-স্রোতে সঞ্চালিত হওয়ার ভয় করিতেছ, তখন 'খুটাটা' ঠিক করিয়া ধরার লোক এ দেশে আমার চক্ষে আর আমি দেখি না। যা' হউক, দুই বৎসর আমাকে এ সংসারে থাকিয়া সংসার করিতেই হইবে, এই স্থির করিয়া বসিয়া আছি। আর কত কাল এ গরল খাইয়া সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ করিব? আমি জানি—এ যুগে সত্যের ধর্ম্ম স্থাপন করিতে হইলে—মিথ্যার সংস্পর্শ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ না করিলে, কিছুতেই জীবের একমেবাদ্বিতীয়ম্ তত্ত্বের অধিকারী হইবার আশা নাই।

জগৎ ভুল, এ জ্ঞান পরিষ্কার রূপে আত্মায় পরিস্ফুট না হইলে কিছুতেই জীবের সত্যের জন্য অনুসরণ-স্পৃহা আসিবে না। যতক্ষণ জগৎ সত্য, ততক্ষণ ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রলাপ-বাক্য ও ভুল। সুতরাং ভুলে ভুল বুঝিয়া স্থির থাকা একেবারেই অসম্ভব। জোর্‌জার্‌ করিয়া প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে জীব কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? যতক্ষণ স্রোতের অপেক্ষা দৈহিক বল প্রবল থাকে, ততক্ষণ জীব স্থির থাকিতে পারে; ক্রমে হাতড়াইতে হাতড়াইতে সীমাবদ্ধ বল ক্ষয় হইয়া দুর্ব্বল হইলেই স্রোতে ভাসাইয়া নিয়া যাইবে। এই মোহ-স্রোতের প্রতিকূলে যাইবার জন্য গুরুর চরণ-তরণীই একমাত্র তরণী। যদি কোন কথায়—সে কথায় গোল ঘটে, তবে আর কোন বলে কুলাইবে না। সুরেশ ভায়াকে নিয়া সময় মতে সাধন সম্বন্ধে আলাপাদি করিবা। * *

বঙ্গাব্দ—১৬-৪-১৮] (৯) [সু

সর্ব্বত্রই বিষয়-ভাবাপন্ন লোক থাকিবে এবং স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে আলাপাদি করিবে—ইহা কাহারও কথায় বা উপদেশে বারণ থাকিবে না। জগতের

বিচিত্রতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলাই সজ্জনের কর্ত্তব্য। যে নিজকে না দেখিয়া পরের প্রতি লক্ষ্য করে—তাহাকে বিষয়-স্রোতে ভাসাইয়া কোথায় নেয়, তাহা সে ঠিক পায় না এবং নিজের অভাব অনুভব করিতে পারে না। তুমি সর্ব্বদাই নিজের অভাব ও নিজের দোষ-গুণ নিজে নিজে চিন্তা করিবে। অপরের প্রতি কোন সময়েই কটাক্ষপাত না কর, এই আমার ইচ্ছা।

বঙ্গাব্দ—২১-৪-১৮] (১০) [সু

যখন—'তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে,' তখন চিঠি অন্য রকম হয়। কোন্ দিন কোন্ অবস্থা থেকে চিঠি-পত্র লিখি, তাহা তুমি চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবা।

আমার বিশ্বাস—বর্ত্তমান University র first, second হওয়ার জন্য পড়া-শুনা করার চেয়ে—প্রকৃত যে বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করিলেই, লেখা-পড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হয়। কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে, নিজের

কি অভাব থাকে, তাহা ছেলেরা কিছুই বুঝেনা; যা'র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা—তা'র চেয়ে কিসে ভাল হইবে, সেই দিকে লক্ষ্য যায়। পড়া-শুনা সম্বন্ধে আমার তত জ্ঞান নাই। জীবনে বই পড়িয়া বিদ্যা উপার্জ্জনের চেষ্টা করি নাই; সুতরাং সে বিষয়ে তুমি যাহা ভাল বোধ কর করিবা।

মোটের উপর যথাসাধ্য চেষ্টায় আছি ও চেষ্টা করিব 'বিশ্বনাথ'এ-বিষ পান করিয়া হজম করিতে পারে কি না। 'বিশ্বনাথ' বাইয়া' উজান যেতে পারুক আর না পারুক, বিপরীত দিকে না 'বাইলেই' যথেষ্ট। পরিষ্কারই পরিলক্ষিত হয়—গুরু সবই করিতে পারেন ও করান। বাস্তবিক পক্ষে—আমার গুরু—"গুরু", অন্ততঃ এটুকু পর্য্যন্ত জ্ঞান আবশ্যক। গুরু লঘু হইলে আর গুরু দ্বারা গুরুর ফল পাওয়া যাইবে না; তখন গুরু সব করেন ও পারেন, এ জ্ঞান থাকিবে না। গুরু সব করিয়া দিবেন, সব পারেন ও করেন এই জ্ঞান থাকিলেই আমি রাজী; তোমার আর কিছু করিতে হইবে না।

ধঙ্গাব্দ—২৪-৪-১৮] (১১) [স্থ

তোমাদের নিকট যে চিঠি-পত্র সর্ব্বদা লিখিয়া থাকি, তাহার সার কি গ্রহণ কর, কিছুই বুঝিতে পারি না। আমার কথা - আমার ভাবে বলি. তোমরা তোমাদের ভাবে, তোমাদের বুঝে, বুঝ। এই দুই ব্যক্তির ভাবের পার্থক্যে বাক্য গুলি তৃতীয় আর এক অবস্থা প্রকাশ করে। যৎ ক্রিয়ায় বা যদবস্থায় যে ভাব বর্ত্তমান, তৎক্রিয়া বা তদবস্থা না জন্মান পর্য্যন্ত তদ্ ভাবের ধারণা বিড়ম্বনা মাত্র। এই ইন্দ্রিয়-জ্ঞান গুলি সত্য, এই ধারণা নিয়া দৃশ্যমান জগতের প্রতি দৃষ্টি করিলে, জগৎ যে কি অপূর্ব্ব রমণীয় মনোহর বিচিত্রতা পরিপূর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহা বাক্য-ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। যতক্ষণ জীবের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ভুল ধারণা না হইয়া ঠিক ধারণা দৃঢ় ভাবে থাকে—ততক্ষণ 'জগৎ মিথ্যা' এ কথাটাই মিথ্যা এবং উপহাসাস্পদ। সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান-বিশিষ্ট জ্ঞানী যোগীদের বাক্যালাপ নিয়া আলাপ করিতে আসাই বর্ত্তমান যুগে ভ্রান্তির কার্য্য হইয়াছে। বিশেষ—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বস্তু গুলিকে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিয়া, তাহা আবার সংসার-ক্ষেত্রে বস্তুর স্ব-স্ব গুণানুসারে প্রয়োগ করিয়া, জগৎ-

বিচিত্রতার সত্য স্বতঃসিদ্ধ রূপে প্রমাণ করিয়া টেলিগ্রাফ্ রেলওয়ে ইত্যাদি দ্বারা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া দৃঢ় সংস্কারাবদ্ধ করিতেছে। মুখে জগৎ কিছু নয় বলি, অথচ শ্যামবাজারে ট্রামে চড়িয়া অনায়াসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পৌঁছিতেছি। এ অবস্থায় বিদ্যুৎ মিথ্যা বলিলে যে, লোকে একটি চপেটাঘাত করিবে না, বিশ্বাস কি? বাস্তবিক পক্ষে, যে পর্য্যন্ত জীবের ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অন্তর্ম্মুখীন না হইবে, সেই পর্য্যন্ত এই বহির্জগৎ মিথ্যা বলাই মিথ্যা। সুতরাং যে জ্ঞানে বা যা'দের জ্ঞানে এ জগৎ সত্য, তা'দের শিক্ষা-উপদেশে থাকা অবস্থায় এ জগৎ মিথ্যা, ইহা বুঝিলে—তা'দের উপদেশ গ্রহণ করা অসম্ভব। শিক্ষা বলিলে যে যা' বুঝে - তাহার নিকট তাহাই বুঝার নাম শিক্ষা। অনেক সময়ে আমার বাঙ্গালা তোমাদের বুঝার পক্ষে কঠিন হইয়া একে আর বুঝ।

যতদূর পার পড়াশুনা নিয়া থাকিবা ও নিয়মিত যতটুকু সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে পার করিবা। সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবা যে, করণীয় ব্যাপার ভিন্ন অন্য কার্য্য করিতে মন অবকাশ না পায়।

বঙ্গাব্দ—২৫-৪-১৮] (১২) [সু

তোমাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে—প্রধান তিনটী উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছি। প্রথম উদ্দেশ্য—প্রাণে আর আপ্‌ছোস্ না থাকে যে, পোলাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইলে ভাল ফল হইত। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—কলিকাতা ভারতের রাজধানী; ভারতবর্ষে জুয়াচুরী কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা নিজে প্রত্যক্ষ কর। প্রত্যেক ব্যাপারেই কৃত্রিমতা, কপটতা ও স্বার্থপরতা মানুষ মাত্রেরই মূল-মন্ত্র। গিল্‌টী ও জুয়াচুরী মানুষের অস্থিমজ্জাগত, ইহা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যেন ভালরূপে বুঝিতে পার যে, কলিতে ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারী নাই। নচেৎ, এক সময়ে হয় ত মনে আসিবে—গুরু কিছু করিলেন না। তৃতীয় উদ্দেশ্য—পোড়া না দিলে সোণা খাটী না মেকী কিছুই প্রমাণিত হয় না। এই তিন মুখ্য উদ্দেশ্যেই তোমাকে কলিকাতা পাঠান হইয়াছে। প্রাণে যেন আর কোন আশা বা আকাঙ্ক্ষা না থাকে।

কলিকাতা গিয়া তোমার মাকে চিঠি-পত্র লিখ কিনা, জানি না। দ্বিজেন্দ্র প্রভৃতিকে ত কোন সময়ে চিঠি-পত্র লিখই না। বাবা,—সব দিক হাত রাখিয়া চলা বুদ্ধিমান ছেলের কার্য্য। যদিও বা পদস্খলন হয়, তবে একটা

কথার সুবিধা ও সুযোগ থাকে। তখন আর আত্মীয়-স্বজনের কাছে দোষী হইতে হয় না। কুটুম্বিতাটা না থাকিলে ত কথাই নাই; যদি কোন দিন আসে, তখন অনেকেই বলিবে—না পারিয়া কুটুম্বিতা। তাহাতে প্রত্যেকের ভিতরে একটা দাগ লাগিবে। এরূপ কার্য্য বুদ্ধিমানের পক্ষে উচিত না। আজ-কালকার কাজ, লোকে পাঁচ দিক হাত রাখিয়া করিয়া থাকে।

প্রায় রাত্রেই চিন্তা করিয়া থাকি,—সুরেন ভিন্ন কে আমাকে এ দুর্দ্দিনে 'আমার' বলিবে। আবার মনে করি, —নগাকে একটু আত্মীয় কুটুম্ব বলিয়া যদি কাজ গুছাইতে পারি, ক্ষতি কি? কি জানি দারুণ কলিকাতায়…র কোন ভুল-ভ্রান্তিতে গোলযোগ ঘটিলে উদরটার উপায়ও থাকিবে না; ইহা ভাবিয়া মাঝে মাঝে ধীরেনের সঙ্গেও কুটুম্বিতা রাখি। সুতরাং তোমারও গুরুর পথ অনুসরণ করিয়া সব দিকই রক্ষা করা উচিত। গুরু পার করিবেন, সে ভরসা ত আছেই। শুনিয়াছি—রামপ্রসাদ নাকি 'মা—মা' বলিয়া পার হইয়াছিল; সুতরাং মা'র সঙ্গে কুটুম্বিতাটা রাখিলে যদি কিছু আগুয়ায়, তা' হ'লেই বা ক্ষতি কি? উপকার করিতে পারুক আর না পারুক, পাছের দিকে টান ধরিলে একটা "ঝকড়া-মকড়ি" ঘটাইতে

পারে, এ কথাটা শাস্ত্রেও আছে। আমিও যে এক-আধটু ভয় না পাইয়া তোমাকে সতর্ক করিতেছি, তাহা নহে।

পার পাওয়াটা যত কঠিন মনে করিতেছ—তত কঠিন কিছুই না। এ সংসারটা যে ভুল, তাহার জন্য আর সাক্ষী-সাবুদ্ আবশ্যক করে না; প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়-যোগেই তাহা প্রত্যক্ষ্য হইতেছে। সেই ভুলটা ঠিক ধারণা হইলেই ঠিক আপনিই আসিয়া পড়ে। ভাব যে একটা স্থির পদার্থ নয়, তাহা ত অনন্ত ভাব অনন্ত লোকের অন্তরে থাকিয়াই প্রমাণ করিতেছে। অনন্ত ভাব ঠিক হইলে কোন ব্যক্তিরই ভুল নাই; ইহা ঠিক হইলেও ঠিক জ্ঞান আসিবে। অর্থাৎ সকল ব্যক্তির সকল ভাব ঠিক হইলে বেঠিক কিছুই থাকে না, সকলই ঠিক। প্রতিনিয়তই ব্যক্তিগত ভাবের পার্থক্য ও বিপরীত জ্ঞান, বিপরীত ধারণা দেখিতেছ। কোনও একটা ঠিক না হইয়া সকল ঠিক হইতে পারে না। যা'র যে ভাব অপর ব্যক্তির ভাবের বিপরীত, সে-ই অপরের ভাব ভুল মনে করে। সুতরাং হয় জগতের সকল ভাব ভুল, না হয় কোনও এক ভাব ঠিক—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কোনও একটা ভাব ঠিক স্বীকার করিলেই যে কোন ভাব ধরা যায়, বিপরীত ভাবে সেটাকে ভুল বুঝিবেই। সুতরাং ভাবাভাব রহিত অবস্থাই ঠিক। যেখানে ভাবা-

ভাব কিছু নাই, সেখানে ভুল কি? অতএব মহম্মদ, খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতির ভাব নিয়া বিচার করিতে গেলে বেঠিক দেখিবেই। তাঁহাদের ভাবাভাব রহিত অবস্থার কোনও কথা পাইলে তাহা নিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবে-তখন আর বেঠিক দেখিবে না। যাহা হউক, পূজার বন্ধে এ সব বিষয় যতদূর পারি প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা করিয়া বুঝাইয়া দিব।

বঙ্গাব্দ—৩০-৪-১৮] (১৩) [স্থ

গুরুর আদেশ পালনে পড়াশুনা করিতেছ শুধু এই বিশ্বাস রাখিয়া, শরীর রক্ষা করিয়া পড়াশুনা করিবা। ফল যাহা হয় হইবে, তাহাতে তোমার কিছু আসে যায় না। সর্ব্বদাই প্রতি পদক্ষেপে স্মরণ রাখিবে, যেন বিষয় ফাঁদে পা না আটকে। কোনও সময় পরের ভাল-মন্দ কিছুর দিকেই দৃষ্টি করিবা না। পরের অহিত করা ত তোমাদের কার্য্যই নয়; পরের মঙ্গল করার সময় এখনও আসে নাই, কারণ এখনও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হও নাই।

বঙ্গাব্দ -৩২-৪-১৮] (১৪) [সু

সর্ব্বদাই চিন্তা করিবা যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা কি? কেবল সংসারের সহিত মিথ্যা, প্রতারণা, জুয়াচুরী, কপটতা, গিল্‌টির চাকচক্য, ভণ্ডামি ও ভাণ। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন অবস্থা যাহা রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাহা হয় কল্পনা—না হয় মিথ্যা-প্রতারণাদি এই ভীষণ সংক্রামক রোগ কোন অদূরবর্ত্তী যুগে আরম্ভ হইয়াছে—আমার প্রাণে অনেক সময়েই ভ্রান্তি আসিয়া অধিকার করে। যে দেশের লোক সত্যের জন্য সমস্ত রাজত্ব বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম-বিক্রীত হইয়াছিলেন (রাজা হরিশ্চন্দ্র), যে দেশের লোক প্রাণাপেক্ষা পুত্রকে বনে দিয়া সেই পুত্র-শোকেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন (রাজা দশরথ), যে দেশের লোক সত্যের জন্য অনায়াসে পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছিলেন (অসমঞ্জ), যে দেশের লোক সত্য-রক্ষার্থ শরীরের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া দিয়াছিলেন (শিবি), যে দেশের লোক সত্য-রক্ষার্থে স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে মিলিয়া পুত্রের দেহ করাতের দ্বারা কাটিয়াছিলেন (কর্ণ-পদ্মাবতী), সেই দেশ—সেই জাতি কি এই? ধর্ম্ম-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াই এই মিথ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। যেখানে সত্যের গন্ধও নাই, সে স্থানে ধর্ম্ম কোথায়? আমি দিন-রাতই চিন্তা করিয়া

থাকি,—কেন এ পণ্ডশ্রম করি? আমার মতে সমাজের কোন কথা তোমাদের কাণে না যায়, এরূপ ভাবে তোমাদিগকে রাখিতে না পারিলে প্রকৃত ব্রহ্মচারী তৈয়ার করা সুকঠিন। ক্রমে মিথ্যা সংক্রামিত হইয়া এমন অবস্থা ধারণ করিবে যে, মিথ্যা ভিন্ন ভারতবর্ষে সত্যের লেশমাত্র থাকিবে না।

এই যে স্বদেশী হুজুক উঠিয়াছে, ইহাতে মিথ্যা ও প্রতারণা আরও বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের ভাল মন্দ কিছুতেই লক্ষ্য থাকা উচিত নয়; আমরা স্বদেশী-বিদেশী কোন কথার সংশ্রবে নাই। আমরা ধর্ম্মের জন্য আছি; আমাদের শত্রু-মিত্র কেহ নাই।

বঙ্গাব্দ—১৬-৫-১৮] (১৫) [সু

আজ-কাল এক ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া বড়ই যাতনায় আছি। কি করি, কিছু বুঝি না। যে দেশে যে বিষয়ের অধিকারী নাই, সেই দেশে সেই বিষয় নিয়া চিন্তা করা, তাহার জন্য পণ্ডশ্রম করিয়া জীবন অতিবাহিত করা যে কি মূর্খতা, তাহা ভাবিয়া প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল। সর্ব্বদা মাথা ঘুরায়, প্রাণ ছট্‌-ফট্‌ করে। অনেক সময়েই

এ ভাবে থাকা উচিত না মনে করি, কিসে যেন আমাকে অলক্ষিত ভাবে দৃঢ়-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ছাড়াইতে পারি না। যাহা বুঝি, এবং বর্ত্তমান জ্ঞানানুসারে ঠিক বলিয়াই ধারণা করি, তাহা ছাড়াইতে পারি না; এ-কি ভীষণ বিপদ !!

ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়ার পূর্ব্বে যে শান্তি পাইতাম এখন আর তাহা পাই না। 'পাগলের' সঙ্গে দেখা হইলে বলিবা, আমার সঙ্গে একবার দেখা হইলে ভাল হইত, নচেৎ পরে অনুতাপ করিতে হইবে। এবার পূজার বন্ধে আসিলে অনেক বিষয় তোমাদের বলিবার আছে, বলিব মনস্থ করিয়াছি।

দিন দিনই যেন আত্মা শুষ্ক ও নিরানন্দ বোধ করিতেছে। ইহার মূলে বাসনা গুপ্তভাবে থাকিয়া আমাকে এ-যন্ত্রনা দিতেছে। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, সংসারের কোন বিষয়েই আমার প্রাণ আছে বলিয়া মনে হয় না, অথচ আত্মানন্দ হইতে বঞ্চিত। পূর্ব্বের মত—অমুক এই হইবে, এই করিবে; অমুক 'এইসা-তেইসা' করিবে—এসব যেন আর প্রাণ চায় না। নিতান্ত নীরস অবস্থা আসিয়া, আশ্রমের কেহই আমার দ্বারা পূর্ব্বের মত আনন্দ পায় না। তোমরা অত্যন্ত উন্মত্তের মত হইয়া আছ—"ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইলে

না জানি কি আনন্দ পাইব"; আমার ভয় হইতেছে না জানি সেই আনন্দের পরিবর্ত্তে কষ্ট পাও। অনেক সময় ইহা মনে আসে—বায়ু প্রবল হইয়া বুঝি আমার এ অবস্থা আসিয়াছে; কিন্তু বায়ুর ঔষধাদি খাইলে বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে তোমার জ্ঞানে গুরুকে কিরূপ ধারণা করিতেছ? গুরু-চিন্তায় প্রাণে কি কি ভাব আসে এবং পূর্ব্বের সহিত তুলনায় গুরু-চিন্তায় কিরূপ আনন্দ পাও? ইহা পত্র পাঠ আমাকে লিখিয়া জানাইবে। এ প্রশ্ন আজ আশ্রম-বাসীদিগের নিকটও করিয়া পাঠাইয়াছি। কে কিরূপ ভাবে আমার অবস্থা ধারণা করিতেছে, তাহা লিখিয়া জানাইবার জন্য সকলকে লিখিয়াছি। তোমা-কেও লিখিলাম। আমার বর্ত্তমান অবস্থাটা দোষের না গুণের, ইহা বুঝিবার জন্য তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইতেছে।

বঙ্গাব্দ—১৮-৫-১৮] (১৬) [সু

এত ব্যস্ত ও অস্থির হইয়া 'বিশ্বনাথের' চিন্তা করি যে, 'বিশ্বনাথের' চিন্তা এক বিন্দুও আমার প্রাণে নাই। 'বিশাকার' চিন্তার মত 'বিশ্বনাথের' চিন্তা করিলে বোধ হয় জগতে আমার কোনও অভাব থাকিত না। 'বিশাকা'-

চিন্তা করিয়া লাভ এই হইয়াছে যে—সে কি করিল, কি হইল, কি করিলে ভাল, কিসে শান্তিতে বা সুখে থাকে ইত্যাদি ; কিন্তু আমার 'বিশ্বনাথের' চিন্তায় নিজের প্রাণে শান্তি ছিল, কেননা সে 'বিশ্বনাথ' সুখ-দুঃখের অতীত। তাঁহার জন্য—সে কোথায় থাকিল, কি রকম থাকিল ইত্যাদি কোন চিন্তাই ছিল না। আমার সে 'বিশ্বনাথ' অভাব পরিশূন্য ; সুতরাং তাঁহার অভাব পূরণের জন্য আমার ব্যস্ততা বা অস্থিরতা ছিল না। বরং যখন তাঁহার চিন্তায় ব্যাকুল হইতাম, তখন নিজের অভাব-বোধ রহিত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিতাম। যখন চিন্তা করি—'বিশ্বনাথের' চিন্তা ছাড়িয়া 'বিশাকার' চিন্তা করিয়া লাভ হইল কি ? তখন দেখি—লাভ যাতনা, ফল বেকুবী। যা'হউক,"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন" ইহা ভাবিয়া নীরব হই। মনে আসে—যখন 'বিশাকার' চিন্তা শেষের দিনেও শেষ হইবে না, তখন 'বিশাকার' মধ্যে বিষয়-বিষ না থাকিলেই কতক উপায় আছে,নচেৎ নিরুপায়। কারণ শেষ চিন্তনীয় বিষয়-মধ্যে যাহা থাকিবে, তাহাই লাভ ও শেষ ফল। * * তুমি আমায় চিন্তা করিয়া তোমার লাভ হয় 'গুরু', আমি তোমার চিন্তা করিয়া আমার লাভ হয় 'বিশাকা'—এই বিনিময়ে তুমি ঠকিয়াছ মনে করিলে, আমার আর দুঃখের কূল নাই। * * যাঁ'র সন্তোষের

জন্য আর্য্য-ঋষিগণ পর্ব্বত-গুহা ও বৃক্ষতল সুখের স্থান মনে করিতেন, এখন আর তাঁহার অন্বেষণ নাই; তাহার পরিবর্ত্তে তোমাদের সন্তোষ করিতে, আমি পাহাড়ময় দোতালা তেতালা টিনের ঘর ও বাগানের কল্পনায় দিন যামিনী অতিবাহিত করি। তথাপি দিন দিন অশান্তি ও বাসনা অনল-জ্বালা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমাকে রাত দিন জ্বালাইতেছে।

বঙ্গাব্দ—১৮-৫-১৮] (১৭) [জ

যে 'হুঁ'-র মূলে 'হু' হইয়া আমাদের গত্যাত্মক জ্ঞান জন্মাইতেছে, সেই 'হুঁ' আমার বুঝা না বুঝা কিছুকেই অপেক্ষা করে না; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ত্রিবিধ অবস্থায়ই হইতেছে। যে কারণে 'হুঁ' আমাদের ভিতর হয়, সেই কারণাভাব 'সঃ' যোগেই নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ আকর্ষিত বায়ু 'সঃ' করিলেই বিসর্জ্জন হয়; সুতরাং 'সঃ' করিলেই ফুস্‌ফুসের দূষিত বায়ুটি বাহির হইয়া যায়। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা 'হুঁ' হইবার কারণ থাকে না। 'হুঁ' না হইলে অথবা 'হুঁ'র মৃদু অবস্থা হইলে, ক্রিয়া বা গতির মৃদু অবস্থার জ্ঞান আপনা আপনিই প্রকাশ পাইবে।

আমরা নিদ্রিত অবস্থায় ঘাড় বক্র করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলে, ঘাড়ে বেদনা হইয়া থাকে। আমার ঘাড় বাঁকা করিবার জ্ঞান থাকা না থাকাকে, বেদনা অপেক্ষা করে না। আমার অজ্ঞাতসারে নিদ্রা আসিয়া আমার চক্ষুদ্বয়কে মুদ্রিত করিয়া ফেলে; দৃশ্যমান জগতের জ্ঞান তখন আপনি অভাব হইয়া যায়। সেইরূপ 'সঃ' উচ্চারণেও 'হুঁ'-র খর্ব্বতা সাধিত হইয়া যে অবস্থা প্রকাশ হইবার, তাহা হইবেই হইবে। আবার 'হুং' উচ্চারণে নিম্নগতি খর্ব্ব হইয়া কণ্ঠে নিরোধ হইলে 'ওঁ' হইবে এবং 'ওঁ' অনুরূপ আমার প্রকৃতি. ধারণা ও জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হইবেই। এ বিষয়টি—সাক্ষাৎ হইলে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেই বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না।

ক্রিয়াদি দ্বারা আমার যে অবস্থা হয়, তাহা দেখিতে কৌতূহল থাকিলে আশ্রমে থাকা অবস্থায় ভিন্ন, দেখা সুবিধাজনক নয়। সাময়িক একটা অবস্থা দেখিয়া, তাহাতে নিজ জ্ঞানানুরূপ জ্ঞানে ধারণা করিয়া সংশয় বৃদ্ধি পাইবে। সমাধিস্থ ব্যক্তির বাহ্যাকার দ্বারা অভ্যন্তরের কিছুই অনুভব হয় না; তখন নিজ জ্ঞানানুরূপ মীমাংসা আসে। অনেক সময় ক্রিয়ামূলক জ্ঞানে, অনেক বিষয়ে আমারও যেন ভুল হয়। আমি ঠিক এরূপ অনুভব করিয়াছিলাম যে—আজ চিঠি পাইব এবং চিঠিতে ব্যক্তি

বিশেষের ও নিজের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমার যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিবে। চিঠি পাঠে দেখিলাম ঐ ধারণায় আমার ভুল হইয়াছে। তাহার কারণ গত্যাত্মক অবস্থায় অনেক সময়ই ঠিক ধারণার ব্যাঘাত ঘটে। মোট কথা—এই কয়দিন যেরূপেই হয় সেইরূপ ভাবে ক্রিয়াদি করিয়া যাও; যাওয়ার পূর্ব্বে যখন সাক্ষাৎ হইবে তখন যাহা হয় বলিব।

বঙ্গাব্দ—২৩ ৫-১৮] (১৮) [সু

* * আসক্তি বা মায়াই বন্ধনের কারণ; আসক্তি ও মায়ার অন্তরালে বাসনা অতি গুপ্ত ভাবে বাস করে। অনেক সময় মহাপুরুষেরাও বুঝিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হইয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ ও আর্য্য-ঋষিদের পুরাণাদি শাস্ত্রে বহু আছে। সর্ব্বদা প্রাণ যেন বলিতেছে—অব্যক্ত ভাবে মায়ামোহের বশবর্ত্তী হইতেছি; এই জন্যই তোমাদিগকে চিঠি লিখিয়াছিলাম, আমার এ-অবস্থাটা তোমাদের ভিতরে ক্রিয়া করিতেছে কি না।

* * সকলে একত্র হইয়া চট্টগ্রাম যাইব এই যে ইচ্ছা, ইহা মোহ বই আর কিসের কাম বুঝি না। দিনের পর

দিন চলিয়া যাইতেছে—আসক্তি দিন দিন হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইতেছে ; এ অবস্থায়ও নিজের উপায় চিন্তা করা উচিত না কি ? যাহাদের আসক্তিতে আসক্তি বাড়িতেছে, তাহারা সকলেই মায়া-মোহাসক্ত ; এ অবস্থায় পরিণাম ফল বিষময় বই আর কি ?

গুরু তোমাদের মত-মতই চলিতেছে ; ইহার ফল এই হইতেছে যে—তোমরা যেমন তেমনই আছ, গুরু ক্রমে তোমাদের মত হইতেছে। যদি গুরুর আসক্তিতে আসক্ত হইয়া তোমরা গুরুর মত-মত চলিতে চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে তোমরা ক্রমে গুরুর মতই হইতে ; গুরু গুরুই থাকিতেন। এ—অবস্থায় যাহাতে উভয় পক্ষের ক্ষতি হয় এমন কার্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

বঙ্গাব্দ—১-৬-১৮] (১৯) [জি

স্বভাবের স্বাভাবিক নিয়ম এই যে—গতি বা Motion মূলে যে বস্তু যত দূরবর্ত্তী হয়, অথবা যে সময়ে, যেরূপ গতিতে যতদূরে যায়, Reaction এও আবার ততবেগে তত সময়ে পূর্ব্বস্থানে পৌঁছে। তৎপূর্ব্বে অস্থির বা ব্যস্ত হইলে কোন ফল হয়না, বরং সেই অস্থিরতা ও ব্যস্ততার মধ্যে

Reaction এর বিপরীত গতি বা Motion এর কার্য্য আরম্ভ হয়। তবে, প্রকৃতির নিয়ম ইহাও দেখা যাইতেছে যে—যেরূপ গতিতে, যেস্থান হইতে যতদূরে গিয়াছি, Reaction এ তাহা অপেক্ষা গতির পরিমাণ যত বেশী হইবে, তত শীঘ্র পূর্ব্বস্থানে পৌছিতে পারি। বিশেষ গতির উৎপত্তি হেতু যাহা, সেই হেতুর অভাব হইলে, স্বাভাবিক নিয়মে আবার পূর্ব্বস্থানে গিয়া পৌছাইবে। দৃশ্যমান জগৎ সত্য, এই জ্ঞানই আমাদের বাহ্যমুখীন বা বহির্গতির কারণ; দৃশ্যমান জগৎ ভুল এই জ্ঞান আসিলে, ব্রহ্মের স্বরূপ যে স্থির অবস্থা—সেই অবস্থায় আমাকে আপনি নিবে। পক্ষান্তরে—গতি নিরোধের প্রতি, যে তিনটা শ্রেষ্ঠ কারণ এ জগতে বর্ত্তমান, সেই তিনটাই তুমি অবগত আছ। সুতরাং তিনটা শক্তি সর্ব্বদা কেন্দ্রাভিমুখে চালিত করিয়া,কিছুকাল অপেক্ষা করিবে। স্বরূপ অবস্থার জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত, স্বরূপ অবস্থার অতি নিকটবর্ত্তী অবস্থায়ও—কাছে কি দূরে কিছু বুঝা যায় না। আমার বিবেচনায়, এ অবস্থায় গুরুর রূপ চিন্তা করিয়া 'গুরু-বীজ' করিতে গেলেও গুরুর রূপ স্মৃতিতে জাগেনা; সুতরাং রূপ-চিন্তার মারামারি করিয়া রূপটা ঠিক করার চেষ্টা করা অপেক্ষা 'মূল-মন্ত্র' ও 'গুরু-বীজ' কিছুদিন করিয়া, ক্রিয়ার একটু খর্ব্বতার অবস্থায় গুরুর রূপ চিন্তা

করিয়া,তখন গুরু-বীজ করিলেই সফলকাম হওয়া যাইবে। আর যদি নিতান্ত পক্ষে শীঘ্রই আমার সাহায্যের জন্য ব্যাকুলতা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে বৃহস্পতিবার, বেলা দুইটার পর হইতে কতক সময় সন্ধ্যা করিবা ; সন্ধ্যা দ্বারা সুবিধা অসুবিধা কি হয় আমাকে লিখিবা। দশমীর দিন হইতে ক্রমান্বয়ে ৩।৪দিন বেলা দুইটার সময় হইতে কতক সময় সন্ধ্যা করিয়া কোন্ দিন কি সুবিধা কি অসুবিধা বোধ কর, আমাকে প্রত্যহ লিখিয়া জানাইবা। সন্ধ্যা করিবার সময়ে হওয়া না হওয়া ; কি, ঠাকুর এই কয় দিন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এই সব কথার কোন কিছু না ভাবিয়া নিয়মিত মত সন্ধ্যা করিবা। তুমি ব্যস্ত বা অস্থির হইবা না।

বঙ্গাব্দ—২০-৬-১৮] (২০) [জ

অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই তিন দিন প্রায় উন্মত্তের মতই দিনাতিপাত করিয়াছি ; ঐ তিন দিন তোমার, আমার সঙ্গে যোগ থাকিয়া থাকিলে,আমার বিশ্বাস ক্রিয়ায় কি ফল ফলে তাহা অনুভব করিয়াছ। * * তোমার অবস্থা যখন যেরূপ হয় আমাকে লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবা। তুমি

সাধনের সময় নানা বিষয় আসে লিখিয়াছ। ক্রিয়া-মূলে বিষয়গুলির উদ্দীপনা হইয়া প্রথম কিছুদিন জল বুদ্‌বুদের মত বিকাশ পায়; পরে বুদ্‌বুদ্‌ জলে মিশিয়া গিয়া আর কোন কিছুই থাকে না। ক্রমে সত্তার জ্ঞান প্রকাশ পাইয়া 'স্বরূপ' অবস্থা বুঝিবে।

বঙ্গাব্দ—৩০-৬-১৮] (২৯) [জ

লিখিয়াছ—চৈতন্যের এ-স্থান, ও-স্থান, এটা, ওটা এই ভেদ করিলে প্রাণে যেন কেমন লাগে; চৈতন্যের এ-স্থান, ও-স্থান, এটা, ওটা কিছুই নাই; সর্ব্ব স্থান চৈতন্য পরিপূর্ণ। যখন সর্ব্ব স্থান চৈতন্য পরিপূর্ণ—তখন সাধন-ভজন, উপাসনাদিও কিছু নাই। কিন্তু যখন উপাসনা আছে, যখন স্থান-কাল ভেদ আছে, যতক্ষণ দেহী ও দেহ পৃথক আছে, ততক্ষণ 'তাঁর'ও স্থান-কাল আছে। কেবল যে, স্থান-কাল আছে তাহা নয়। স্থান-কাল ভেদে জ্ঞানেও সম্পূর্ণ বিপরীত ভেদ-বোধ হয়, যথা—কর, চরণ, মস্তক, উপস্থ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ের ভেদে ভেদ বোধ, ভেদ ধারণা। এই ভেদ-জ্ঞান বর্ত্তমানে, ব্রহ্মের স্থানও আছে—ভেদাভেদও আছে। ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টিপাত

করিলে জগতের অন্য জ্ঞান রহিত হয়; আবার উপস্থের চিন্তা আসিলে কামাদি বৃত্তির উদ্দীপনা হইয়া নানাপ্রকার অসৎ কার্য্য করায়। এই হেতু ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া অতি ক্ষুদ্র বস্তুর চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ার জন্য, ঋষিরা নাসিকা-মূলে পর-ব্রহ্ম নিহিত এই কথা বলিয়াছেন। অপরপক্ষে—আমরা ক্রিয়া-বিশিষ্ট জীব; আমরা ক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই ক্রিয়া-রহিত স্থানে পৌঁছিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। মানবের দেহে Medulla oblongata হইতে ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া ক্রিয়া-মূলক জ্ঞানের সূত্রপাত হয়; আবার ঐ স্থানে গিয়া নিরোধ হইয়া,ক্রিয়া-মূলক-জ্ঞান রহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুরই ক্রিয়ার আরম্ভ স্থানেই আবার ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। ক্রিয়া রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভেদাভেদ-জ্ঞান রহিত হইবে না এবং সর্ব্বত্র চৈতন্য দেখিবে না। ভেদাভেদ-জ্ঞান নিয়া সর্ব্বত্র চৈতন্য দেখিতে গেলেই, চৈতন্য বহুরূপী এবং পাপ-পুণ্য সবই করেন দেখা যাইবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে—আমার ক্রিয়ায় মনোযোগ না থাকিলে ক্রিয়ানুরূপ ফল হইবে কেন? রামমূর্ত্তি ও Sandow ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। কোন অবয়বের কোন অঙ্গে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ক্রিয়া বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলে অমনই বৃদ্ধি হয়—এ যুক্তি,

ক্রিয়া ও অবয়ব সম্বন্ধেই ঠিক বটে। আমরা জগতে যতপ্রকার কর্ম্মাদি করিতেছি, তাহার অনেক কর্ম্মেই ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া করি না; কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা না করিলেও ফলে বাধা থাকে না। পাল্কী বহন-কারী বেহেরা স্কন্ধ স্ফীত হউক এ-আকাঙ্ক্ষা না করিলেও তাহার স্কন্ধ স্ফীত হয়। উচ্চ পর্ব্বত-নিবাসী অসভ্য জাতিদের সর্ব্বদা পর্ব্বতারোহণ করা হেতুই—পায়ের থোরা মোটা হয়। আমাদের দেহে যে,রক্তাধার হইতে সর্ব্বদা চতুষ্পার্শ্বে রক্ত সঞ্চালন হইতেছে, তাহা আমাদের ইচ্ছা কি অনিচ্ছা কিছুকেই অপেক্ষা করে না; কিন্তু সেই রক্ত সঞ্চালন জন্য দেহের যে যে ক্রিয়া হওয়া আবশ্যক,তাহা হইতেছে। ক্রিয়া-মূলক কার্য্য, প্রবৃত্তি-মূলক কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ রূপে অপেক্ষা করে; কিন্তু ক্রিয়া-রহিত অবস্থার কার্য্য বা নিবৃত্তির কর্ম্মে প্রবৃত্তির তত প্রয়োজন করে না। কারণ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি-বলে রহিত বই প্রকাশ পায় না; সুতরাং নিবৃত্তির কার্য্যে প্রবৃত্তির প্রবল অবস্থা হইলে নিবৃত্তি অসম্ভব। মোটকথা—যে 'হুঁ' নিবৃত্তির জন্য 'মূল-মন্ত্র'; সেই 'হুঁ' আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুকে অপেক্ষা করে না; উহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থায়ই হইতেছে এবং তদনুরূপ জ্ঞান ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। সুতরাং বরাবর 'হুঁ'-র বিপরীত ক্রিয়া 'মূল-মন্ত্র' সর্ব্বদা

অভ্যাস করিতে করিতে ‘হুঁ’-র পরিবর্ত্তে ‘সঃ’-ই স্বাভাবিক হইবে। * *

তোমাকে যাহা লিখিলাম, তাহা কতদূর বুঝিতে পারিবে তাহা নিজেই বুঝি না। তোমার বুঝ নিয়া তুমি বুঝিলে নানা গোলই ঘটিবে। তোমার দেশ, কাল ও পাত্র জ্ঞান আছে, অথচ সর্ব্বত্র চৈতন্য যেমন বুঝিয়াছ—আমার এ-কথাও সেইরূপ বুঝিবে। দেশ, কাল ও পাত্র ক্রমে একটা আর একটাকে অপেক্ষা করিয়া যেরূপ জ্ঞান আসিয়াছে, সেইরূপ একটা বাদ দিয়া আর একটা বুঝিতে বুঝিতে—দেশ-কাল-পাত্র জ্ঞান রহিত হইবে এবং সর্ব্বত্র চৈতন্য দেখিবে—বুঝাবুঝি সবই ঘুচিয়া যাইবে, কেবল নাম-নামী বাদ দিয়া যাহা বুঝিবার, তাহা বুঝিবে। কিছু কাল একত্র না থাকিলে, বুঝাবুঝিতে শেষে বা ভুল বুঝায়, এই এক চিন্তার কারণ। মনুষ্য মাত্রের ভিতরেই বুঝাবুঝি আছে; নিজ নিজ বুঝ অনুসারে সকলেই বুঝে এবং এক জনের বুঝ আর এক জনকে ভুল বুঝে। প্রকৃত বুঝ বুঝিতে হইলে বুঝাবুঝি বাদ দিতে হইবে। বুঝাবুঝি থাকিলেই ভেদ থাকিবে এবং ভেদ বুঝিবে। মোট কথা—তুমি ছয় মাস নিয়মিত ক্রিয়া করিয়া দেখিবে। আর তাহা না পারিলে—যেরূপ বুঝিলে তোমার বুঝ মত হয়, সেই রূপেই ‘তাঁহাকে’ বুঝিবে;

নচেৎ বুঝিবার প্রবৃত্তিই একেবারে লোপ পাইবে এবং কোন দিনও বুঝিবার ইচ্ছা থাকিবে না। কারণ, বুঝিবার ইচ্ছাতেই বুঝিতে চাও; না বুঝিয়া যে চুপ করিবে, কিছুতেই সম্ভব বোধ হয় না। কেহই বুঝিয়া বুঝে নাই; বুঝ ভুল করিয়াই বুঝিয়াছে। বুঝ ভুল করিতে না পারিলে, বুঝিলেও 'কাঁঠালের আমসত্ত্বের' মত বুঝা যায়। বাবা—আমি বড় কষ্টে আছি। আমি যতকাল বুঝাবুঝি নিয়া বুঝিতে গিয়াছি, ততকাল বুঝিয়া বুঝিতে না পারিয়া, প্রাণ কিছু নাই বলিয়া শুষ্ক ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। আবার বুঝাবুঝি বাদ দিয়া যখন 'কেউ আছ' এই বিশ্বাসে কাঁদা-কাটি করিয়াছি, তখন কাঁদিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা পাইয়াছি। কিন্তু বৃত্ত্যাদির বশে সে আনন্দ স্থির থাকেনা; যা'হউক, কিছু না থাকা অপেক্ষা সে-টুক্ থাকাও ভাল। 'নাই মামার থেকে কাণা মামাও ভাল;' এজন্য বলিতেছি বুঝাবুঝিতে গোল লাগিলে—না বুঝিয়াই কে আছ রে—কে আছরে'—চীৎকার করা ভাল। * *

নঙ্গাব্দ - ১১-৭-১৮] (২২) স্ব]

সর্ব্বদাই মনে রাখিবে চতুর্দ্দিকে বিষয়-সঙ্গ। সঙ্গ অতি ভীষণ জিনিস; সঙ্গ প্রভাবে সব সম্ভবে। কিন্তু সব অবস্থায় গুরু-চিন্তা থাকিলে, কোন রকমেই অপর সঙ্গ-দোষ বা গুণ প্রাণকে স্পর্শ করে না। ইহা বই সঙ্গ-রোগ নিবৃত্তির দ্বিতীয় ঔষধ নাই। জগতে যত প্রকার সংক্রামক রোগ আছে, তাহার মধ্যে সঙ্গের মত সংক্রামক ব্যাধি আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বদাই গুরু নামামৃত পান করিলে সর্ব্ব রোগ বিদূরিত হয়; কোন রোগ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। মনকে পড়াশুনার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে গুরু-চিন্তায় ব্যাপৃত রাখা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত একমাত্র বিধি; ইহা বই বিধিও অন্য বিধি জানে না। 'অমুক' কাশী গিয়াছে; বেদান্ত পড়িবার চেষ্টায় আছে।

'যস্য অন্যগতির্নাস্তি তস্য বারাণসী গতিঃ'। * * কিন্তু আমি সেই বারাণসীর অধিশ্বর বিশ্বেশ্বরের মুখের বাক্য ভিন্ন অপর লোকের কথায় বিশ্বাস করি না। বিশ্বেশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

গুরু-বাক্য যা'র সহ্য হয়না 'তস্যগতিঃ কুত্রাপি নাস্তি' —এ আমার ধ্রুব সিদ্ধান্ত। বারাণসী জীবের একমাত্র গতি, এ কথাটি যে সময়ে বলা হইয়াছিল, সেই সময়ে গুরুগত-প্রাণ লোকই বারাণসীতে বাস করিত। এখনকার বারাণসী অন্য রূপ। তীর্থ-স্থান গুলি সাধু সঙ্গের জন্য মাত্রই ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; গুণ্ডা, কুলোকের সহবাসের জন্য নয়। এই সব পরিবর্ত্তন দেখিয়া তোমাকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে—কু-সঙ্গ অতি ভীষণ জিনিস। ভেদ-জ্ঞান নিয়া, অভেদ-জ্ঞানের বেদান্ত-সিদ্ধান্তও ভেদ-বুদ্ধি বৃদ্ধি বই হ্রাস করে না। যেমন সরিষা ভুতে পাইলে ভুত ছাড়াইবার উপায় থাকে না, তেমনি ভেদ-বুদ্ধিতে অভেদ-জ্ঞান কিছুতেই জন্মে না।

বহেরা গাছটা কাটাইলে পর, বহু তক্তা ও সুন্দর তক্তা হইবে বলিয়া লম্ফ-ঝম্ফ করিয়া গিয়া দেখিলাম— গাছটার মধ্য দিয়া 'ঢুরা' হইয়া গিয়াছে; তখনই মনে পড়িল·· ···কে ভর্ৎসনারূপ করাত দিয়া দ্বিধা বিভক্ত না করিলে যে, তাহার ভিতরে সার-শূন্য 'ঢুরা', তাহা বুঝিতাম না। মিষ্ট-বাক্য ও মিষ্ট-ব্যবহার দ্বারা মানুষের পরীক্ষা হয় না; কটু-বাক্য ও কর্কশ ব্যবহার দ্বারা যে, মানুষের পরীক্ষা হয়, ইহা আমার শিক্ষা হইল।

'চাচা আপনা বাঁচা', যাহা বুঝিয়াছ—তাহাই ঠিক।

আমি আর গুরু, ইহা ভিন্ন তৃতীয় আর যে কোন বিষয়ই প্রাণে স্থান পায়, সেই বিষয়ই তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবে। আমার সকলই আমার মত; সুতরাং আমার মত কার্য্যগুলি ত্যাগ করিয়া, তাঁহার মত কার্য্যগুলি না করিলে, আমি আর তাঁহার মত হইতে পারি না। আমার মত কার্য্যগুলি প্রকৃতি যোগে বিনা চেষ্টায় অনায়াসেই হইতেছে; তাঁহার মত কার্য্য করিতে গেলে আমার চেষ্টা, যত্ন ও ক্রিয়া আবশ্যক,অথবা তাঁহাকে আবশ্যক; এই সিদ্ধান্ত—এই শেষ মীমাংসা।

বঙ্গাব্দ—১২-৭-১৮] (২৩) [স্থ

কলিকাতায় শান্তির কি আছে যে, শান্তি পাইবে? জীবের যখন প্রবল গুরু-জ্ঞান আসে তখন জগতের সকলই বিরুদ্ধ; এমন কি সার্দ্ধ-তিন হস্ত পরিমিত দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিবে যে, বিরুদ্ধ ভাবে গুরু হইতে বিপরীত দিকে টানিতেছে। গুরু ভিন্ন অন্য বস্তুতে যোগ না থাকিলে, ঐ সব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আমার কিছু আসে যায় না। গুরু হইতে যেই বিন্দুমাত্র কালের জন্য বিচলিত হওয়া যায়, অর্থাৎ

গুরু-চিন্তার অভাব হয়, তৎক্ষণাৎ সব পরমাণু হইতে বিরুদ্ধ দিকে গতি আরম্ভ হয়। এই জন্যই সর্ব্ব-শাস্ত্রে কেবল এক মাত্র গুরু-চিন্তাই জীবের পার হওয়ার তরণী বলিয়া গিয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে, চিন্তানুধ্যান করিয়া দেখিলেও দেখা যায়—গুরুর 'উ' কারের ঘাটে আমার মন থাকিলে, দেহাদির অনুভূতি থাকে না এবং দেহ-জনিত ক্রিয়ায় আমার কিছু আসে যায় না। বিশ্বনাথ হইতে হইলে বিশ্বের এই এক মাত্র নিদান,কারণের কারণ আদি কারণ। ইন্দ্রিয়াগম্য অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-ধামে যাইতে হইলে, বিচার-রহিত হইয়া নির্দ্বন্দ্বভাবে সেই গুরুর চরণ-তরণী চিন্তা করিতে হইবে। সেই চিন্তার অবস্থায় ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-জ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে চিন্তা করিবার জন্যই 'গুরু-বীজ' ও 'মুল-মন্ত্র'।

গুরু মঙ্গলময় এ-ধারণা সর্ব্বদা না থাকিলে, ভাল-মন্দ জ্ঞানে মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিয়া অমঙ্গল ঘটাইবেই ঘটাইবে। মঙ্গলামঙ্গল বিচার 'আমি'-জ্ঞানের কার্য্য; 'আমি'-জ্ঞান প্রবল থাকিলে মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা প্রাণে আসিবেই আসিবে। * * তোমরা স্থূল-জ্ঞান ও স্থূল-দৃষ্টিতে দেখিয়াই ব্যস্ত ও

অস্থির হইয়া পড়। জগতের কার্য্য-কারণ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত, অনেক সময়েই অনেক অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব বোধ হইবে। এ অবস্থায় যে পর্য্যন্ত আমাকে আমি না বুঝি, সে পর্য্যন্ত অন্যকে বুঝাবুঝি নিয়া চিন্তা বা বিচার করিতে গেলেই ভ্রম-কূপে ডুবিতে হইবে। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি, যাহাকে অতি সৎ বা পবিত্র বলিয়া ধারণা করি, তাহার অন্তরে আমার জ্ঞানের অন্তরালে অতি অপবিত্র ভাব, ভেল্‌কীবাজির ভেল্‌কীর মত সর্ব্বজনের চক্ষু আবৃত করিয়া লুক্কায়িত থাকে। এরূপ স্থলে আমরা একে আর বুঝিয়া ভ্রান্তিতে পড়ি।

আমি জানি—গুরুর গুরুত্বকে অতিক্রম করিতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের গুরু-ভারও পারে না; সামান্য কলিকাতা গুরুর গুরুত্ব কি রকম করিয়া খর্ব্ব করিবে? সমস্ত সৌরজগতের পরিমাণ যাঁহার নিকট রতি-মাসা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কলিকাতার ওজন কত ক্ষুদ্র, তাহা কোন সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। সুতরাং গুরু-জ্ঞান বর্ত্তমানে, এ সব অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে ভয়ের কারণ কি? গুরু-জ্ঞান অভাবে সামান্য ক্ষুদ্র কীটাণুর চাপও অতি গুরুতর। * * মঙ্গলময় আমার মঙ্গলের জন্যই তোমাকে আনিয়া যুটাইয়াছেন; আমার নিশ্চয় ধ্রুব বিশ্বাস যে—জ্ঞানাতীত জ্ঞানে গেলে 'পূর্ণানন্দের'

বাসনা পূর্ণ হইবে, না হয় 'সে', বিষয়ে মিশিয়া গেলে 'পূর্ণানন্দের' আর এ-বিষয় ব্যাপার থাকিবে না।

বঙ্গাব্দ—১৩-৭-১৮] (২৪) [সু

পিতামাতার প্রকৃতি সব সময়ে এক ভাবে অবস্থান করে না; বিশেষ, প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে এক ভাবে থাকা নিতান্তই অসম্ভব। সন্তান, পিতামাতার যখন যে প্রকৃতি থাকে, সেই প্রকৃতির অনুরূপ প্রকৃতি নিয়াই জন্ম গ্রহণ করে। জীবের জ্ঞানের জন্য শাস্ত্রকারেরা বিশেষ প্রমাণ রামায়ণ মহাভারতের অনেক স্থলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র রাবণ, কুম্ভকর্ণ; দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ; এরূপ আরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে।

বঙ্গাব্দ—১৪-৭-১৮] (২৫) [জ

আমি বেশ নিরাপদে আছি। জগতে আপদ ত কিছুই নাই; সর্ব্বত্রই সেই সর্ব্বময়ের খেলা—'সে' ছাড়া কি আছে? তবে আপদের জিনিস জগতে কি? 'সে' ছাড়া

অন্য যখন দেখি,তখনই আপদ-বিপদ। আজ-কাল 'তাঁহার' প্রতিমূর্ত্তি ৮।১০টি বালক বালিকা আসিয়া জুটিয়াছে; তাহারা রাত্রি-দিন হা-হৈ চীৎকার করিয়া রোদন করে। ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের হর্ষ-বিষাদ পরিপূর্ণ ধ্বনি 'তাঁহার' মায়া-মোহ অবস্থার অবস্থা আমাকে সম্যক্ বুঝাইতেছে; 'তাঁহার' বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য অবস্থা চতুষ্টয়ের ভেদে জ্ঞানের ভেদ আমাকে শিক্ষা দিতেছে। তাহারা মা, বাপ, পুত্র, কন্যা, সখা সাজিয়া আমাকে প্রকার ভেদে জ্ঞান-ভেদের উপদেশ করিতেছে। 'তাঁহার' বদ্ধ মুক্ত উভয় অবস্থায়—'তাঁহার' নিজের অবস্থা এক, ইহা আমাকে বুঝাইতে—ইহারা বহু মূর্ত্তি ধরিয়া, আশ্রমে আমাকে বহু জ্ঞানে সুখ-দুঃখ অনুভব করাইতেছে।

বাবা, এ-সংসারে কত দেখিলাম, কত শিখিলাম, কত বুঝিলাম, কত বুঝাইলাম; কিছুতেই বুঝের অভাব হইতে চায় না। কা'রে বুঝাই, কে বুঝে, ইহা যে বুঝিনা ইহার উপায় কি? বুঝিতে গেলেই বুঝের মত বুঝি, আর বুঝাবুঝি নিয়া অভিমান! বুঝাবুঝি বাদ দিয়া যখন একটু স্থির থাকি তখনই স্থির বুঝি। আবার কি বুঝি, কা'রে বুঝি, ইহা যখন বুঝিতে চাই, তখন দেখি কিছুই বুঝিনা। অনেক সময়ই মনে হয় এ-বুঝে কিছু বুঝা যায় না, তথাপি বুঝ ছাড়িতে পারি না। কিন্তু বুঝ

থাকিতে বুঝ কিছুতেই বুঝিবেনা যে, আমি বুঝিনা। বুঝের উপর সমস্ত দুনিয়া; বুঝ বাদ দিলে দুনিয়াদারী কিছু থাকে না।

তুমি আমার কথাটা বিশ্বাস করিয়া 'গুরু-বীজ' করিয়া দেখিবে কিছু বুঝা যায় কি না? সমস্ত ক্রিয়া এক হইয়া যা বুঝায়, সেই বুঝটাই ঠিক? না বিভিন্ন ক্রিয়ায় যে বিভিন্ন বুঝায়, সেইটাই ঠিক? 'তাঁ'কে' প্রাণ ঢালিয়া দেও, 'সে' যা বুঝায় বোঝ; কা'রো বুঝাবুঝিতে গিয়া বুঝিবেনা। যে বুঝিয়াছে সে বুঝিয়াছে। না বুঝা পর্য্যন্তই বুঝাবুঝি আছে; বুঝিলে আর বুঝিবার থাকে কি? * * আমি তোমাকে বলিয়া আসিয়াছি যে, শাস্ত্রকারেরা কাচপোকা অর্থাৎ কুমারিয়া পোকার দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে দিয়াছেন—যেরূপ বস্তুর চিন্তা করিবে সেইরূপ গুণ পাইবে। ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—২।৪ দিন অবশ্য গুরু-চিন্তা করিয়াছ; তাহাতে বিষয়-বাসনা বৃদ্ধি করে, না অভাব করে? এটা জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল এই যে—আমি বিষয়ী না অবিষয়ী? আমি ধর্ম্মতঃ বলিতেছি ইহা কিছুই বুঝিতেছি না।

তুমি কবে ঢাকা পরিবর্ত্তন হইবে ইহা জানিতে পারিলে আমাকে জানাইবা। তুমি ঢাকা গেলে আমি ঢাকা গিয়া একবার বুঝাবুঝি করিয়া দেখিতাম, আমি,

'ঢাকা' পড়ি না 'উদ্‌লাই' থাকি। আমি আরও অনেকবার ঢাকা গিয়াছি একবারও 'ঢাকা' পড়ি নাই, 'উদ্‌লাই' আছি। তুমি ঢাকায় শেষ 'ঢাকা' ফেলাইতে পার কি না, এই আমার শেষ বাসনা।

বোধ হয় তুমি ঢাকা গেলে মা'র ঢাকা আসার সম্ভব। মা'র সঙ্গে একবার দেখা হওয়ার জন্য বড়ই প্রবল পিপাসা ছিল। আমি বাপের সন্তান, কিন্তু মা'রই অভাব। এ দুর্ভাগা ভারতে কি, মা আর জন্মিবে না ? মা-মা বলিয়া আজ ৭০ বৎসর কাঁদিতেছি। কয়েক বৎসর মা'র কোলে ছিলাম; অত্যন্ত ত্যক্ত-বিরক্ত করায় আজ ৯ বৎসর যাবৎ মা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। তদবধি মাতৃ-হীনের ন্যায় কাঁদিতেছি। যদি মা নাই যোটে, তবে বাবার কাছেই যাইব এই মনন করিয়াছি।

'গুরু-বীজ' করিয়া জগৎ-গুরুকে ২।১ দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি, তুমি কোথায় ? কি অবস্থায় সর্ব্বত্র থাক ? আমি যে বহুমূল্য ধন এভারেষ্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘার উপত্যকা ভূমি হইতে প্রাণ বিনিময়ে আনিয়াছি, তাহা অতি আদরের সহিত তোমাকে দিয়া আসিয়াছি। তুমি কিছুকাল করিয়া—অন্ততঃ ছয় মাস নিয়মিত সন্ধ্যাদি করিলে নিশ্চয় ইহার উপমা-রহিত অনির্ব্বচনীয় ফল বুঝিতে পারিবে। আমি প্রাণের সঙ্গে বুঝিয়াছি প্রাণময়কে জানিতে হইলে,

ইহা বই আর অন্য উপায় নাই। আমি সমস্ত ভারত বেড়াইয়া এই উপায়কেই এক মাত্র উপায় বলিয়া বুঝিয়াছি। আমার এ-বুঝে যে ভুল আছে, ইহা কেহ বুঝাইলেও বুঝিব না; তবে কেহ ভুল-জ্ঞান দিয়া বুঝিতে গেলে ভুল বুঝিবে। তোমাকে যাহা দিয়া আসিয়াছি তাহার উপরে আমার কিছু জানা নাই; তাহার উপরে যে কিছু বলে, তাহা আমি ভ্রান্তি মনে করি। সে কেবল কথার কথা, তাহাতে কথা বৃদ্ধিই পাইবে, কথা রোধ হইবে না। 'কথার কথা র' জন্য কথা খুঁজিলে এ-কথায় ফল হইবে না। কথা বাদ দিয়া 'সে কোথা' তালাস করিতে হইলে এই মাত্র এক কথা। এক কথার জন্য এক কথা; এক কথার মানুষ না বলিয়াই 'গুরু-বীজ ও মূল-মন্ত্র' দুই কথা।

বঙ্গাব্দ—১৫-৭-১৮] (২৬) [সু

কাহাকেও দৃষ্টান্ত স্থল বা লক্ষ্য করিয়া কেহই এ-পথে অগ্রসর হইতে পারে না; এক মাত্র 'গুরু' লক্ষ্য ভিন্ন লক্ষিত স্থানে পৌঁছা যায় না। গুরু লক্ষ্য ভিন্ন অন্য লক্ষ্য আসিলে নিশ্চয়ই হইবে না। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া দিনাতিপাত করিতে পারিবে কি না, তাহা ভাবিয়া

পরিষ্কার লিখিয়া জানাও। আমার প্রাণে আর এ পুতুল-খেলা—গুরু-শিষ্য-খেলা দেখিবার ইচ্ছা নাই। দিন ফুরাইয়া আসিল, এখনও কেন মোহে পড়িয়া থাকি? কেন আর আমি জল্পনায় দিন কাটাই? তুমি যদি এই ভাবে স্থির থাকিতে না পার বলিয়া সংশয় আসে, তাহা হইলে বাবা, পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়া দে।

বঙ্গাব্দ—১৭-৭-১৮] (২৭) [স্থ

তোমার পোষ্ট-কার্ড পাইলাম; দিন বড়ই দুর্দ্দিন। প্রকৃত তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ঘোর অমানিশার তমসায় আচ্ছন্ন; এ-সময়ে কেহই কাহাকেও দেখে না। অন্ধের পক্ষে ত একেবারেই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার; চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির পক্ষেও, ক্ষণে ক্ষণে চমকিত ক্ষণ-প্রভালোক—সেই আলোকে স্বরূপ অবস্থার জ্ঞান অসম্ভব। গম্যস্থান কোথায়? তাহার পর-প্রান্ত দৃষ্টি-পথের অতীত—এ অবস্থায় ক্ষণস্থায়ী ক্ষণপ্রভার দৃষ্টিতে প্রাণ স্থির থাকিতে পারে না। তাই সময় সময় প্রাণে প্রবল আতঙ্ক উপস্থিত হয়—কোথায় যাই, কি করি, কি দেখি ইত্যাদি চিন্তা প্রাণকে আকুল করে। বিশেষ—যে সময়ে চপলালোকও

লক্ষিত হয় না, তৎসময়ে প্রাণে ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত হয়; প্রতি পদক্ষেপে সংশয় হয়—কি জানি কোন অতল তলে নিপতিত হই. অথবা কোন্ কণ্টকাবৃত অরণ্যে সূক্ষ্ম সূচীকার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া-বা অসময়ে প্রাণ হারাই। তাই, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি সঙ্গী কে আছরে? ইহার দ্ব্যর্থ বা অস্পষ্ট উত্তর প্রদান করিলে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রাণ 'আই-ঢাই' করে। দস্যু রত্নাকরের কথা আজ স্মৃতি-পথে পতিত হইল। মনে হইতেছে, আমি যেন ঘোর অন্ধকারে দিক্-দেশ নির্ণয় না করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি। আমার সঙ্গী কি কেহ আছ? আমি যে সঙ্গীর সঙ্গে গেলে, এই অন্ধকারের মধ্য দিয়াও গমন করিলে গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারিতাম, তাহার সঙ্গ, মা'র মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছি। কিছুদূর মা'র সঙ্গে সঙ্গে গমন করার পর, হঠাৎ সেই পর-প্রান্তের আলোক দেখিয়া, সে আমার সাহায্যেই আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া. কোথা দিয়া চলিয়া গেল ঠিক পাইলাম না। পরে মনে করিতেছিলাম, এই পথে আরও দুই একটি যাত্রী যাইবার সময়ে—তাহাদের সঙ্গ অবলম্বন করিব। এই প্রতীক্ষায়ই, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করিয়া, ভগিনী যোগেশ্বরীর আশায় বসিয়াছিলাম। সে, পথের

দুর্গমতা দেখিয়া আস্তে আস্তে পশ্চাদ্দিকে—যে স্থান হইতে আসিয়াছিলাম, সেই দিকেই গমন করে। কিছুদিন পর, সঙ্গী পাইলে "আমি যাইব, আমি যাইব" বলিয়া একটি অপরিচিত যুবক আমার নিকটে উপস্থিত; এখন তাহাকেই অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। সে আমাকে আমার পূর্ব্ব পরিচিত পরম-বন্ধুর নিকট লইয়া যাইবে, এই আশায় আশান্বিত হইয়া আছি। ক্ষণে ক্ষণে অবিশ্বাস আসিয়া আমার প্রাণে প্রশ্ন উঠে – যাহাকে বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছি, আমার সেই বিশ্বাসী লোকটি প্রাণের সহিত বিশ্বাস করে কি না? আমি মা'র প্রলোভন-বাক্যে যাহাকে ভুলিয়াছি বা যাহার সঙ্গ ছাড়িয়াছি, এই নবাগত যুবকের সঙ্গে থাকিয়া আমার সেই সঙ্গ লাভ হইবে কি? ক্রমে দেখিতেছি অন্ধকার যেন আরও গাঢ়মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সময় শেষ হইয়া যাইতেছে; শেষদিনের পূর্ব্বে শেষ স্থানে পৌঁছিতে না পারিলে,না জানি আমার ভাগ্যে শেষে কি আছে? শাস্ত্র ও যুক্তি-তর্কে বুঝা যায়,যে কোন ভাবেই হউক না কেন, তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারিলেই সব চিন্তা শেষ হয়। আমার প্রাণে অনেক সময়ই প্রশ্ন আসে—সেই চিন্তারও কি কোন বিশেষত্ব আছে, না চিন্তা করিলেই হয়? সংসারে সুখ-দুঃখের চিন্তা ত রাত-দিনই করিলাম, তবুও চিন্তার অবসান হইল না।

যাহাহউক, বৎস! 'বিশ্বনাথ' হওয়া কি বিষ পান করিয়া হজম্ না করিতে পারিলে হয়? তুমি যে লিখিয়াছ,—'বহেরা গাছ 'ঢুরা' হইলেও তার অবশিষ্ট কাঠের দ্বারা যে কাম করা যাইবে, তাহা উঁই-এ ধ্বংস করিবে না'; ইহা তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি। সারভাগ নষ্ট হইলে অসারভাগ পচিয়া মাটি হইয়া যায়; তদ্দারা কোন কাযই হয় না। বিশেষ অসার জিনিস কোনও প্রয়োজনেই আসে না। এ-আশ্রম বালুস্তুপ পাহাড়ের উপর অবস্থিত; এখানে খৈর কাঠেরও (Iron wood) বালুতে কতকাংশ নষ্ট হয়। বহেরার কাঠ এখানে কোন কাযেই লাগিবে না; ইহা আমি ধ্রুব বুঝিয়াছি। ও-সব কোন চিন্তা বা আলোচনায় কোনও ফল নাই; কেবল 'চাচা আপন বাঁচা' তোমার যে কথা, সে কথাই ঠিক।

একটু বেড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছি; এ বিষয়ে তোমার মত কি লিখিবা। নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘকাল একস্থানে বসিয়া থাকা আমার মত চঞ্চল প্রকৃতির লোকের পক্ষে বড় কষ্টকর।

জীবের প্রবল বিষয়-বাসনা থাকিতে ভগবৎ-চিন্তা বিড়ম্বনা ও কথার কথা মাত্র। বিষয়ে বিষ-বোধ না হইলে অমৃত খুঁজিবে না। বর্ত্তমান যুগে যেরূপ বিষ-কৃমি বিষ পানে পরমানন্দ অনুভব করে, সেইরূপ বিষয় হইতে

উদ্ভূত বিষয়ীও বিষয়কে অমৃত মনে করে; সুতরাং বিষয়ীর সঙ্গ ও বিষয় বিষবৎ পরিত্যজ্য—এই মহামন্ত্র সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। নচেৎ প্রতিপদেই পদস্খলনের সম্ভাবনা, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্গাব্দ —২৩-৭-১৮] (২৮) [সু

চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী পদার্থ, তৎশক্তি তাহাতেই নিহিত; শক্তি নিহিত অবস্থায় চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। চৈতন্যের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অর্থাৎ অপর কোন রকম জ্ঞান নাই; যেহেতু—তাঁহাতে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা এই ত্রিবিধ ভেদ থাকে না এবং কোন অভাবও থাকে না; তিনি পূর্ণ। চৈতন্যের যখন যে দেশ হইতে বা যে স্থান হইতে ক্রিয়া আরম্ভ হয়, শক্তির বা ক্রিয়ার তারতম্যে তাঁ'র আকার—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের ভেদ হয়; কিন্তু তোমার দেশ-কাল জ্ঞান-থাকা হেতুতেই, তোমাকে দেশ-কাল এই শব্দ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। বাস্তবিক পক্ষে প্রথমে দেশ-কাল থাকে না; প্রথমে কেবল ক্রিয়া-মূলে স্বরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া—স্বরূপ অবস্থা ও ক্রিয়া-মূলক অবস্থা, এই দুই অবস্থার তুলনায় 'আমি'

মাত্র জ্ঞান হয়। পরে, পরপর ক্রিয়ার পার্থক্য হেতু ক্রমশঃ জ্ঞানের ভেদ হইয়া, বহু অনন্ত জ্ঞান আসিয়া -- (দেশ-কাল ইত্যাদিও এইক্রমে আসিয়া) অনন্ত ভাবে অনন্ত প্রকার ভেদ-বিশিষ্ট সৌরজগতের জ্ঞান হয়। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদি হইতে ক্রমশঃ শব্দেরও পরিবর্ত্তন হয়; সর্ব্ব আদি শব্দ 'প্রণব', পরে 'হুঁ'-- যথাক্রমে ই,ঋ,ঌ স্বরগুলিতে এবং পশ্চাৎ ব্যঞ্জনাত্মক ধ্বনিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ক্রিয়া বা রূপাদির দ্বারা রূপাতীত অবস্থায় যাইতে হইলে—দৃশ্যমান জগতের যেরূপ দেখিতেছি, তদতিরিক্ত কোন রূপ বা আকার আমরা কল্পনা করিতে পারি না; তবে, একরূপ চিন্তা দ্বারা অপর রূপের অভাব করিতে পারি। সেই প্রকার— যেরূপ ক্রিয়া ও ক্রিয়ানুরূপ জ্ঞানে, যে ক্রিয়া অনুভব করি, সেইরূপ ক্রিয়াই কল্পনা করিতে পারি; তবে এক ক্রিয়ায় থাকিয়া অপর ক্রিয়া রহিত করিতে পারি মাত্র। কিন্তু শব্দ ধরিয়া ক্রমান্বয়ে এক শব্দের পর অপর শব্দ পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রিয়ার আদিতে যে শব্দ হইতেছিল, অর্থাৎ 'প্রণব' অবলম্বনে অপর সমস্ত শব্দই বাদ দিতে পারি। প্রণব ধরিলেই আমরা সেই আদিম অবস্থায় যাই, অর্থাৎ কেবল 'আমি' অবস্থায় যাই। প্রণবের দ্বিবিধ অবস্থা ঃ—স্বাভাবিক নিয়মে প্রণব-ধ্বনি ও আমার

কল্পিত প্রণব-ধ্বনি ; অর্থাৎ আমার অহং-জ্ঞান নিয়া প্রণব করার নাম কল্পিত প্রণব এবং 'মূল-মন্ত্রের' প্রথম অক্ষর 'হং' দ্বারা কণ্ঠ-দেশ নিরোধ করিলে যে প্রণব হয়, তাহার নাম স্বাভাবিক প্রণব। স্বাভাবিক প্রণবে গেলে কেবল 'আমি'-ই থাকে, সেই 'আমি'র দিক্-দেশ-কাল কোন জ্ঞানই থাকে না, কেবল আমি মাত্র জ্ঞান থাকে। সুতরাং আমাদের স্বরূপ অবস্থার কেবল 'আমি'কে অনুভব করিতে হইলে 'মূল-মন্ত্রই' এক মাত্র নিদানভূত উপায়। সেই 'মূল-মন্ত্র, গুরু-বীজের' সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না। 'গুরু-বীজ' ভিন্ন আমার আংশিক শক্তি দ্বারা যে কোনও ক্রিয়া করিনা কেন, তদ্দারা আংশিক জ্ঞান ও আংশিক বোধ ভিঃ অপর কিছু সম্ভবপর নয়। 'গুরুর খাট বা সমষ্টি আমি'র স্থান, আংশিক জ্ঞানে পাওয়া অসম্ভব। আমাদের যত কিছু অশান্তি, অসুখ, অভাব ও দুঃখ -ভেদ-জ্ঞানই তাহার কারণ ; ভেদ-জ্ঞান অভাব হইলে জ্ঞানের অভাব কই? তখন জ্ঞানই মাত্র জ্ঞান। এই হেতুতেই—'তাঁহাকে' জ্ঞানময় বলা হইয়াছে। অত যুক্তি-তর্ক বিচারের আবশ্যক কি? তুমি-আমি—আমি-তুমি, কেবল তোমার আমার মধ্যে যা' কিছু আছে—তাই নিয়াই তুমি-আমি। তুমি-আমির পরিণাম—'আমি-আমি' অথবা 'তুমি-তুমি'।

বঙ্গাব্দ—২১-৭-১৮] (২৯) [সু

চিঠি-পত্র লিখিতে বসিলে মনে হয় কি লিখিব—কি বুঝাব—লিখা-লিখি,বুঝা-বুঝির কিছুই নাই এ-জগতে। বুঝ থাকিতে যাহা বুঝা যায় না—তাহা বুঝিয়া, কেমন করিয়া বুঝাইব? তবে বুঝ থাকিতে যে বুঝা যায় না, তাহা বুঝাইবার জন্যই নানা কথা লিখি। বুঝ দিয়া যাঁরা বুঝিতে গিয়াছে, তাঁরাও বলিতেছে—সৌরজগতের কোথায় কি আছে বুঝি না। এ পর্য্যন্ত বুঝা-বুঝি নিয়া কেউ কিছু বুঝে নাই; তবে বুঝ না থাকিলে, বুঝে বুঝি না এ-কথাও থাকে না; অতএব আমার মতে বুঝ না থাকাই প্রকৃত বুঝার উপায়। 'বুঝিনা জ্ঞান' থাকে বলিয়াই বুঝ অপূর্ণ থাকে; বুঝা-বুঝি রহিত হইলে যখন 'বুঝি না' থাকে না, তখন 'বুঝি' এ-কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে,—না হইলে 'বুঝি না' জ্ঞানের এই আকার থাকে না কেন? তবে বলিতে পার 'কিছুই বুঝি না' ইহাই তৎকালীন জ্ঞানের আকার। কিছুই বুঝি না—কি বুঝিব না—ইহা বলিয়া, কিছু না বুঝিয়া মানুষ থাকিতে পারে কি? তাহা হইলে, যাঁরা বুঝিয়া গিয়াছেন, তাঁরা অবশ্য এমন একটা কিছু বুঝিয়াছিলেন—যাহা বুঝিলে আর বুঝিবার থাকে না। এই বুঝটা বুঝিবার জন্য

আমি যত প্রকার বুঝিয়া দেখি, সর্ব্বাবস্থায়ই এক 'গুরু' বুঝিলে আর বুঝিবার থাকে না, ইহা বুঝি। আমার এ বুঝটা ঠিক না ভুল? এ-বিষয়টা তুমি একটু চিন্তা করিয়া দেখিবে।

বুঝ ক্রিয়া-মূলক; 'গুরু' বলিলে যে সব স্থানে ক্রিয়া থাকিয়া বুঝা-বুঝি-জ্ঞান আসে—সে সব স্থানে ক্রিয়া থাকে না; মন-প্রাণে 'গুরু' বলিলেই ইহা অনায়াসে অনুভব করা যায়। এই জন্যই আমার আর বুঝাইবার কোনও কথা নাই। এক কথাই বার বার লিখি, এক কথা বই দুই কথায় গেলেই বুঝা-বুঝি আসে; যে-কারণে আমি তোমাদের নিয়া রাত-দিন বুঝা-বুঝির মধ্যে আছি। যাহা কিছু সব,—এক কথার ভিতরে না থাকিলেই, নানা প্রকার সময়-কাল-দেশ-পাত্র-দিক্-দেহ-মন-ইন্দ্রিয় ইত্যাদির জ্ঞান আসিয়া অজ্ঞানতায় ডুবাইয়া দিবে। এক 'গুরু' বুঝে কলিকাতা, দিল্লী, লাহোর, ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ইত্যাদি স্থান-ভেদে কোন ভেদ করিবে না, ভেদও হয় না; কারণ, ঐ বুঝে দেশ-কাল-জ্ঞান অভাব করে। অতএব গুরু-জ্ঞান অভাব করিয়া দেশ-কাল-জন্য ক্রিয়াগত বৈষম্য হইয়া চীৎকার, কেবল দেশ-কাল-জ্ঞানেই জন্মায়। আমি তোমাদের এটা-ওটা-সেটা ইহা শুনিলেই বুঝিব—'গুরু'ভিন্ন এটা-ওটা

চিন্তা আসিয়াই তোমাদের এই চীৎকার ও আলাপ। ক্রমে সময় চলিয়া যায়, আর দিন হইতে দিনান্তরে— মাস হইতে মাসান্তরে—দূরে থাকার সময় নিকট হইয়া আসিতেছে; কিন্তু এ দিন-কালও গুরু-জ্ঞান অভাবে তফাৎ বোধ জন্মাইতেছে; সুতরাং নিকটে থাকিলেও, দেশ-কাল-জ্ঞান থাকিলে দূরে থাকিতে হইবে, ইহা চিন্তা কর কি? নিকট আর দূর দেহীর দেহ বোধই কারণ; মনের বা আত্মার নিকট আর দূর নাই।

বঙ্গাব্দ—১৪-৭-১৮] (৩০) [জ

তোমাদের সাধন-প্রণালী যদিও ভারতে আদি সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত ছিল, তথাপি প্রায় ৭।৮ হাজার বৎসর যাবৎ একপ্রকার বিলুপ্ত; কাজেই অনেক সময় ইহা মানুষের ধারণার বিষয় নয়। বিশেষ—দৃষ্টান্ত স্থলেরও অভাব। পক্ষান্তরে,বর্ত্তমানে সাধন বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহার সহিত ইহার কোনও নিকট সম্বন্ধ নাই; সুতরাং প্রতিপদেই বিঘ্ন। সংসারের অনুকূল ধর্ম্ম, মানুষের পক্ষে নিজ নিজ ভাবানুসারে দিবা রাত্রির মধ্যে কতক সময় ভাবাই সুবিধাজনক। "ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং" অবস্থা ভাব দ্বারা ধারণা হয় না বলিয়াই, মনে অনেক সময়ে অনেক ভাব উঠে—এটা স্বাভাবিক।

বঙ্গাব্দ—২৬ ৭-১৮] (৩১) [জ

বাবা! তোমার চিঠি পাইয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিলাম। * * * ইহা বোধ হয় পরিষ্কার বুঝিয়াছ যে, 'আমি' ক্রিয়ার পুতুল; ক্রিয়া-মূলে আমার অনন্ত জ্ঞান—অনন্ত ভাবে,অনন্ত শব্দে, অনন্ত প্রকারে বিরাজ করিতেছে এবং শব্দ বিশেষে সেই অনন্ত জ্ঞান, জ্ঞানাতীত এক অভূতপূর্ব্ব এক জ্ঞানে নিয়া যাইতে পারে। 'আমি' সর্ব্বাবস্থায় এক রূপে থাকি না; রোগ, শোক, দৈন্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি আমাকে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পরিবর্ত্তন করে। সেই পরিবর্ত্তনের অবস্থায় আমি পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্ব 'আমি'কে ভুলিয়া যাই; অথচ সর্ব্বাবস্থায়ই 'আমি এক'—এ-জ্ঞান ও এ-ধারণা ঠিক থাকে। আমার যে, অবস্থা বিশেষে পরিবর্ত্তন হয় তাহা আমি বুঝি কই? 'আমাকে' যখন আমি বুঝি না, তখন 'গুরুকেও' বুঝি না; সুতরাং আমি যখন যে অবস্থায় থাকি, গুরুকেও সেইরূপ দেখি। কেবল আমার পরিবর্ত্তনেই জগতের সকল পরিবর্ত্তন দেখিতেছি; সুতরাং আমার অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থাতেই জগৎকে এক দেখিব।

মা'র এ-সব সাধন সম্বন্ধে মতামত কিছু জানিয়া

থাকিলে আমাকে জানাইবা। আমি মা'র জন্যই ব্যস্ত আছি। সংসারে দুইটা জিনিস এক ভাবাপন্ন না হইলে সাধনে বিশেষ বিঘ্ন ও অন্তরায় ঘটে

তুমি যে একটু কষ্ট পাইয়াছ, এ-সংবাদে আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। আমি আমার ছেলেদের কোন কথা বলিতে বা তাহাদের শাসন করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হই না। যখন প্রাণের সঙ্গে বুঝি আমার, তখন আমার পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কোনও কার্য্য করা হয় না এবং কথা-বার্ত্তা বলিতেও ভাল-মন্দ বিচার থাকে না। বিশেষতঃ আব্দারীয়া ছেলেপিলের মেজাজ্ সব সময়ে এক রকম থাকে না ইহা পিতা-মাতার একটু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

বঙ্গাব্দ—২৬-৭-১৮] (৩২) [ন

বাবা! গুরু এ-ঘোর কলিতে বহুরূপী না সাজিয়া কিছুতেই শিষ্য রক্ষা করিতে পারেন না। শিষ্যের প্রতি-নিয়ত পরিবর্ত্তন; সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে, গুরুকেও পরিবর্ত্তিত দেখে। গুরুও কতক পরিবর্ত্তিত হন; না হইলে শিষ্যের সঙ্গে যোগ থাকা অসম্ভব। আবার

যাহারা যে ভাবে দেখিতেছে, তাহারা গুরুর সহিত অন্যের অন্য ভাবে যোগ দেখিয়া—পরিবর্ত্তন বুঝিয়া ব্যাকুল হয়। গুরু মঙ্গলময়, গুরুর কেবল তাহা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য নাই, ইহা স্থির ধারণা করিয়া থাকিতে না পারিলে, শিষ্যের স্থির থাকা অসম্ভব। গুরুর পক্ষে এক অবস্থায় থাকিয়া বিভিন্ন শিষ্য রক্ষা করা এ-কালে অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত শিষ্য মায়া-মোহ অতিক্রম না করে, সে পর্য্যন্ত মায়া-মোহ-মুগ্ধ শিষ্যের জন্য গুরুর মায়া-দয়া সকলই দরকার।

আমাকে আমি অনেক সময় চিনি না; আমি অবস্থা বিশেষে যাহা ছিলাম অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমি যে তাহা নাই, ইহা আমি বুঝি কই? সব অবস্থায়ই আমি আমার মত; আমি পূর্ব্বে ও পরে যে এক মত নই, তাহা আমায় বুঝায় কে? আমি ক্রিয়ার পুতুল; ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে আমার পরিবর্ত্তন, অথচ ক্রিয়ারও পরিবর্ত্তন আমার জ্ঞানে ধারণা হয় না। এ-অবস্থায় গুরু এক অবস্থায় থাকিলে, গুরু আমার থাকিবে কেন? তাই গুরু বহুরূপী,—গুরুর মায়া-দয়া, স্নেহ-মমতা সকলই আছে; গুরুর হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ আছে, কিন্তু মূলে কিছুই নাই—গুরু গুরুই আছেন। কেবল আমার জ্ঞানেই, আমার জন্যই গুরুর সকল আছে। যদি আমি এক অবস্থায় থাকি, তাহা হইলে গুরুর অবস্থান্তর দেখিব না।

বঙ্গাব্দ—২৬-৭-১৮] (৩৩) [স্ন

তোমার যা' বাসনা,—দিন দিন যেন সেই জ্ঞানই আমার প্রবল হইতেছে। তোমাদের কাহাকেও এই ঘোর কলির গুরুতা ব্যবসায় করিতে আমি কোন সময়ে অনুমতি দিব না; কোন সময়ে নিজের ইচ্ছায় করিলে করিবে। এমন ভীষণ জ্বালাদায়ক ব্যবসা জগতে আর দ্বিতীয় নাই; যা'র ভাল হইলে প্রশংসা নাই; মন্দে অশেষ যন্ত্রনা। আজ কয়েকদিন আমি কোথায় আছি কিছু ঠিক পাইতেছি না, অথচ আমাকে সব করিতে হয়।

সর্ব্বদাই চিন্তা ও অনুধ্যান করা কর্ত্তব্য যে, এ-সংসারটা অপূর্ব্ব পুতুল-খেলা; এই পার্থিব সম্বন্ধ একটা ভেল্‌কী-বাজী। এই দৃশ্যমান জগৎ সর্ব্বৈব ভোজ-বাজীর খেলার মত; অথচ এ ভোজ-বাজী এমন অপূর্ব্ব যে, ইহাকেই ঠিক বলিয়া ধারণা করিয়া, এই বাজীতে বাজিয়াই খেলা করিতেছি। প্রকৃত কর্ত্তব্য কি, কোন সময়েই প্রাণে আসে না; প্রাণে আসিলেও সেইটিই যেন ভুল, আর যাহা করি তাই ঠিক এ-জ্ঞান আসে। এক মাত্র গুরু-বাক্যই জীবের সম্বল; প্রাণে এব-ল না থাকিলে কিছুতেই এ কুহকিনী প্রকৃতির কুহক হইতে নিস্তারের উপায় নাই। যাহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধের স্মৃতি ছিলনা,

* * * এবার তা'রাই বিশেষ আত্মীয় হইয়া পড়িল এবং সেই আত্মীয়তার স্মৃতি যেন আস্তে আস্তে মনের কতটুকু স্থান অধিকার করিল। কি কুহক, কি মোহ, কি অপূর্ব্ব মায়া !! ইহার হাত এড়াইতে হইলে, ইহার কোন প্রকার সংস্পর্শে যাওয়া উচিত নয়। যে কোন প্রকারে ঐ কুহকিনীর কোনও কুহকের খেলায় যোগ দেওয়া যায়, তাহাতেই আবদ্ধ হইতে হয়। একেবারে সর্ব্বাবস্থার সহিত সম্পর্ক-রহিত হইয়া এক মাত্র গুরু সম্বল না করা পর্য্যন্ত ঐ বাজীকরীর হাত এড়াইবার উপায় নাই। তবে যদি কেহ গুরু-কৃপায় এই কুহকিনীকে চিনিতে পারিয়া থাকে. সে আর ইহার কোনও রঙ্গে ভুলে না। তৎপূর্ব্বে ইহার যে কোন খেলায়ই যোগ দেওয়া যায় না কেন, তাহাতেই সে ভুলাইয়া কোথায় নিয়া ফেলে !! এমন কি অনেক সময়ে আপনাকেও আপনি চিনিতে পারা যায় না। এই আশ্রমের প্রথমাবস্থায়—মায়ের কোলে তা'র প্রাণের ধন গোপাল এই বুঝে আমি যা' ছিলাম, পরে বহু আত্মীয়-বন্ধুর সহিত মিলন হওয়ার পর. এখন আমি তাই কি না, চিন্তা করিতে গেলে কিছুতেই আপনাকে আপনি চিনিতে পারি না। এইরূপ অবস্থায় যখন আমাকে আমি চিনি না, তখন আমি যেরূপ হইলে, অর্থাৎ আমাকে আমি যেরূপ বুঝিলে গুরুকে বুঝিতে পারি, আমি সেরূপ আছি কি না

তাহাও বুঝিতে পারি না। আমি যেরূপ থাকিলে, অর্থাৎ আমাকে আমি যেরূপ বুঝিলে গুরুকে বুঝিতে পারি, তাহার পরিবর্ত্তন হইলেই গুরুকে বুঝারও পরিবর্ত্তন ঘটে। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় আমি একরূপ না থাকিলে—গুরুকে সর্ব্বাবস্থায় একরূপ বুঝিব না। আমার অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর অবস্থারও পরিবর্ত্তন দেখিব। এইজন্যই বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন গুরু ও বিভিন্ন শিক্ষার দরকার। এখন তোমাদের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরু বহুরূপী না সাজিলে কিছুতেই তোমাদের তৃপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় ইহার অন্তরে এক ভীষণ অন্তরায় বিরাজ করে। গুরু যখন বহু শিষ্যের দ্বারা সমন্বিত থাকেন এবং শিষ্যদের মধ্যে পরস্পারের ভাবের পার্থক্য থাকে, তখন গুরুর প্রত্যেকের ভাবে যোগ দিতে হইলে একরূপ থাকা অসম্ভব। যে স্থলে প্রত্যেকের মধ্যে বিভিন্ন ভাব,সেই স্থলে গুরু একের ভাবে যোগ দেওয়া অবস্থায়, অপরে বিপরীত দেখে। সেই সময়ে একটা ভীষণ গোলযোগ হয়। যখনই গুরুকে তোমার ভাবের বিপরীত দেখ, তখন আর তোমার ভাল লাগে না। কিন্তু গুরু কখন কি করেন, কখন কি ভাবে চলেন, ইহা যদি বহু শিষ্য একত্রিত থাকা অবস্থায়—শিষ্যেরা বিচার করে, তবে গুরুকে একেবারেই বুঝিতে

পারে না। এই একটা ভীষণ অন্তরায়। কেবল গুরু মঙ্গলময়, তিনি অনন্ত প্রকারে অনন্ত ভাবে বিকাশ হইয়া, এই অনন্ত জ্ঞান অভাব করিবার জন্যই অনন্ত খেলা খেলেন—ইহা নিশ্চয়রূপে ধারণা করিতে না পারিলেই, গুরুর কার্য্য বিচার করিয়া জীব সেই কুহকিনীর কুহকে পড়ে। আবার এই উপদেশের মধ্যেও গুরু-জ্ঞান-বিহীন শিষ্যের এ-মোহ জন্মিতে পারে যে গুরু, নিজ বাসনানুরূপ কার্য্যের সুবিধার জন্য এরূপ যুক্তি দিয়া শিষ্যকে ছলনা করিতেছেন। ইহাও প্রকৃতপক্ষে অনেক স্থলে ঘটিতেছে। আমি যতই চিন্তা করি—দেখি সেই কুহকিনীর অপূর্ব্ব কুহক-জাল সংসারে বিস্তৃত আছে।

বঙ্গাব্দ—৩০-৭-১৮] (৩৪) [জ

বৎস! যে জ্ঞান নিয়া গুরু বা ব্রহ্ম চাহিতেছ, সেই জ্ঞানের হেতুভুত ইন্দ্রিয়াদি, গুরু বা ব্রহ্মের কোনও বিষয় কোনও অংশে কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি Vibration বা ক্রিয়া-মূলে অনুভব করায়, অর্থাৎ স্পন্দন-মূলে ইন্দ্রিয়ের বোধ জন্মে। Vibration বা

ক্রিয়া-মূলক বস্তু ভিন্ন [অপর সত্তা] ইন্দ্রিয় যোগে অনুভব হওয়া অসম্ভব। শাস্ত্রীয় মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার সমস্তই ক্রিয়া-মূলক পদার্থ; সুতরাং বোধ বা ধারণা যাহাতে হয় তাহাও ক্রিয়া-বিশিষ্ট। অতএব [এই জ্ঞান] কোনও ক্রমে ক্রিয়া-মূলক জ্ঞান ভিন্ন ক্রিয়াতীত জ্ঞান সম্ভবপর নয়। মনকে অতিক্রম করিয়া আমাদের ধারণা বা অনুভূতি হয় না; এবং বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়াও আমাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে না। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিলুপ্ত অবস্থায় মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকে কি না—জিজ্ঞাস্য। সাময়িক ভাবে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য নিরোধ করিলে, যে মন-বুদ্ধি ইত্যাদির কার্য্য বর্ত্তমানে দেখা যায়, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ব-সংস্কার হেতু। ইন্দ্রিয়ের সংস্কার সহিত ইন্দ্রিয়-জ্ঞান লোপ পাইলে,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারের অস্তিত্ব থাকে কি না, তাহা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীব মন-বুদ্ধি-চিত্ত ইত্যাদির সংযোগে বিচার করিতে গেলে ঠিক করা কঠিন। মনে কর, তুমি মনে মনে চিন্তা করিতেছ—'আমার শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-জ্ঞানের কোন-টাও না জন্মিলে, বর্ত্তমানে আমি যে আমাকে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-বিশিষ্ট বলিয়া বুঝিতেছি, তাহা আমার মন বুঝিত কি না'?—ইহার উত্তর মন কি দিতে পারে? ইহা মন কেমন করিয়া বুঝিবে? কারণ, মনটা ইন্দ্রিয়ের সংস্কার মাত্র;

মনের কার্য্য বুঝা ; কাযেই মনের একটা বুঝ আসিবে যে, সে বুঝিতে সক্ষম; সেই বুঝটা এইরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইত ইহা মনের ধ্রুব ধারণা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয় সংস্কার ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান রহিত হইলে, মনের অস্তিত্ব থাকে কি না, থাকিত কি না, এবং মনের অতীত একটা বুঝ আছে কি না, (অর্থাৎ সীমাবদ্ধ বুঝের অতীত একটা বুঝ আছে কি না), মন ব্যতীত অন্য বোদ্ধা বা অন্য বোধকারী আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান কি না, তাহা অনুভব করা যায়। তৎপূর্ব্বে—অর্থাৎ মন বর্ত্তমান থাকিতে উহা অনুভব করিতে গেলেই, স্থির অনুভব না হইয়া সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক একটা ধারণা হইবেই হইবে।

ইহাও মনে রাখা উচিত যে, ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবের মনের অতীত কোন ধারণার জিনিস আছে বুঝিতে গেলে, ভুল বা কল্পনা বলিয়া নিশ্চয় ধারণা হইবে; সুতরাং যতকাল আমি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিচার করিব, ততকাল মনের অগম্য বিষয় আমার বিচার্য্য নয়। বিচার করিলে একে আর ধারণা করিব, না হয় ভুল বুঝিব। সুতরাং সেই বিচার ও সিদ্ধান্তের দিকে না গিয়া, কেবল ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে যে অবস্থায় যাহা বুঝায়, তাহা বুঝিলে ঠিক বুঝিব। আমাদের বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য অবস্থা চতুষ্টয় ভেদে ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে প্রতিনিয়ত

বিভিন্ন রকম বোধ জন্মিতেছে। যাহার যেরূপ জ্ঞান হইতেছে, অর্থাৎ brain-এ যেরূপ Vibration হইতেছে, তাহাকে সেইরূপ বুঝাইলে—সে ঠিক বুঝিবে ; সেইরূপ না বুঝাইয়া স্বরূপ অবস্থা বুঝাইলে সে ভুল বুঝিবে। হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে আর্য্য ঋষিরা ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন করাইয়া বুঝের পরিবর্ত্তন বুঝাইতে চাহিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন বুঝা কেবল একটা কল্পনা মাত্র। আমাদের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া যখন যে অবস্থা হয় তাহাই বুঝি ; ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন না করিয়া বাক্য-ভাষায় কেবল একটা কল্পনা মাত্র বুঝি, অথবা অপরের বুঝানুরূপ বাক্যগুলিকে শুনিয়া নিজ বুঝ অনুসারে একে আর বুঝিয়া বসি। শৈশবে বৃদ্ধের বাক্য-গুলি আমাদের পক্ষে কোনরূপ কার্য্যকরী হয় না ; এজন্য অতি অপোগণ্ড শিশুকে উপদেশের দ্বারা তাহার ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। কিন্তু ক্রিয়ান্তর যোজনা দ্বারা তৎ-ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করা যায়। বালক ক্রিয়ান্তরে নিযুক্ত হইয়া তৎ-ক্রিয়ানুরূপ অনুভূতি দ্বারা পূর্ব্বানুভূতি বিস্মৃত হয় ও তৎ-ক্রিয়ায় আসক্ত হয়। জ্ঞানও তৎ-ক্রিয়ানুরূপই থাকে। এজন্য বলিতেছি বাক্য ও ভাষা দ্বারা এ-সংসারের কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না। এ জগৎ-জ্ঞানের কারণ motion বা ক্রিয়া ; ক্রিয়া পরিবর্ত্তনেই এ জগৎ-জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইবে। রাত দিনই এ ব্যাপার

ঘটিতেছে। কি প্রাণী জগতে, কি জড় জগতে—সর্ব্বত্রই প্রতিনিয়ত ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন অনুভব হইতেছে। এ-সমস্তই ক্রিয়া-মূলক ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞান; ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে ক্রিয়া-মূলক পরিবর্ত্তিত অবস্থাই অনুভব করিবে। ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞান বাদ না দিলে ইন্দ্রিয়াতীত-জ্ঞান কিছুতেই সম্ভব নয় ও ক্রিয়া-রহিত অবস্থাও ধারণার বিষয় নয়।

ক্রিয়া-রহিত একটা অবস্থা বা বিষয় ধ্রুবই আছে, না হইলে motion বা ক্রিয়ার আধার কে? তবে ক্রিয়া-বিশিষ্ট জ্ঞানে ধারণা হইবে যে,ক্রিয়াতীত বিষয় আমাদের ধারণার বিষয় নহে। ক্রিয়া রহিত হইলেই ক্রিয়া-রহিত অবস্থার ধারণা আসিবে; তখন আবার ধারণায় ক্রিয়া অনুভব হইবে না—ক্রিয়াটা ভুলই বুঝিব। সেই অবস্থায়ই আর্য্য ঋষিরা দিক্-দেশ-কাল-পাত্র বিচার-ভ্রান্তি বলিয়াছেন। বৃদ্ধের কথা বালকের পক্ষে যেমন অশ্রাব্য বলিয়া মনে হয়, আর্য্য ঋষিদের বাক্যও ক্রিয়া-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে তেমনই অশ্রাব্য বলিয়া মনে হয়। তুমি "চিত্ত-লয়" কথাটা একটা কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করিতে এবং আমার নিকট দীক্ষিত হইয়াও উহার সত্যতা সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস করিতে পার নাই—কল্পনা বলিয়াই ধারণা ছিল। পরে যখন

ক্রিয়া-মূলে তুমি সেই অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছ, তখন আর তোমাকে বুঝাইতে যুক্তি-তর্কের আবশ্যক হয় নাই। চিত্ত লয় যে কবি-কল্পনা. সে সংশয় তোমার একবারে দূর হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সহস্র উপদেশেও আমি এ কথা তোমাকে বুঝাইতে পারিতাম না। কারণ, যে বুঝে তুমি বুঝিতে, সেই বুঝে ইহা বুঝা অসম্ভব। বুঝিয়া বুঝে'র বিষয়ই বুঝা যায়, 'না-বুঝ'—বুঝিয়া হওয়া যায় না। অতএব লিখি—তুমি 'মূল-মন্ত্র ও গুরু-বীজ' নিয়মিত করিয়া যাহা বুঝিবে, তাহা আমার বাক্য-ভাষা দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা নিষ্ফল প্রয়াস। বিশেষতঃ ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার যোজনা হয়; ক্রিয়াতীত অবস্থা হওয়া একবারে অসম্ভব—বাক্য-ভাষা দ্বারা ক্রিয়াই যোজনা হয় ক্রিয়াতীত অবস্থা হওয়া একবারেই অসম্ভব।

বাবা! কেন যে আমি এ-পণ্ডশ্রম করি—সেই ভাবনা আমাকে আকুল করিয়াছে। যদি উপর আকাশে সমস্ত সৌর-জগৎ পরিভ্রমণ করা যায় এরূপ উপদেশ তোমাদিগকে দিতাম, তাহা হইলে উহা আশু অসম্ভব হইলেও গত্যাত্মক বুদ্ধিতে ক্রমে শুনিতে শুনিতে গতি-বৃদ্ধি হইয়া কতকটা সম্ভবপর বলিয়া বোধ করিতে পারিতে। গতি-বিশিষ্ট জীবকে গতি-মূলক-শব্দ ও আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা অগতির কথা বুঝাইতে গেলে কিছুতেই ধারণা হয় না। যদি বা

ধারণা হয়,তবে অতিশয় আশঙ্কা ও ভয়ের উদ্রেক করে—সে আবার কি ভীষণ! ইহা বলিয়াই প্রাণ নীরব হইতে চায়। যা' হউক, গত্যাত্মক-আনন্দই আমরা আনন্দ বোধ করি; তুলনা-রহিত আনন্দ যে, গতি-রহিত অবস্থায় অবস্থান করে, তাহা গতি রহিত না হইলে অনুভব হইবে না। যে কোন অবস্থায়ই আমি উপস্থিত হই না—সে অবস্থার অনুভূতি বাক্য-ভাষা দ্বারা অনুভব করান যায় না।

মা, মাতৃ-হীন সন্তানের বিষয় কি লিখিয়াছে লিখিবা।

বঙ্গাব্দ—৩০-৭-১৮] (৩৫) [সু

জীব ভ্রান্তিতে ডুবিয়া আছে; ভ্রম বশে ভ্রান্তিকে ভ্রম বলিয়া বুঝে কই? বিশেষ—বুঝিবার জন্য যে সব যন্ত্র, অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল—সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের বুঝই ভ্রান্তির হেতু। অতএব যাহা দ্বারা বুঝি এবং যাহা বুঝি,তাহা অনন্ত-কালেও এই বুঝ বজায় রাখিয়া, এই বুঝের যন্ত্র দ্বারা ভুল বুঝিব না। এই হেতুই ঋষিরা শাস্ত্রাদিতে বিচার করিয়াছেন—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বুঝের অতীত কোন একটা বুঝ আছে কি না এবং তাঁহাদের অপর বিচার্য্য বিষয় এই যে,

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ভ্রম-প্রমাদের এক মাত্র হেতু। এতদ্‌ভিন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ নিয়া তাঁহাদের কোন কথাই কোনও শাস্ত্রে নাই; যেহেতু কথা দ্বারা তাঁহার কোন সত্য নির্ণয় হয় না। ভ্রমের কারণ যাহা, তাহার অভাব না হইলে কিছুতেই স্বরূপ জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। অতএব ভ্রমের কারণ যে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বুঝ—সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ানুরূপ বুঝের অভাব না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ব্রহ্ম-জ্ঞান বা গুরু জ্ঞান লাভ হয় না। এখন জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে ভুল, তৎ-সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াই এই চিঠি সমাপ্ত করিব।

প্রথমতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির একটা স্থির স্বরূপ অবস্থা নাই। দেহের প্রারম্ভে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কোন আকারই থাকে না; ক্রমশঃ আকার প্রকাশ পাইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইত্যাদি আকারে পরিণত হয়। আবার বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য, অবস্থা চতুষ্টয়ের ভেদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ আকারের ভেদ হয়, অর্থাৎ স্পর্শন-দর্শনাদি জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হয়। যৌবনে যেরূপ দৃষ্টি-শক্তি থাকে, বাল্যে বা বার্দ্ধক্যে সেরূপ থাকে না। যে জিনিস পরিবর্ত্তনশীল—তদ্‌দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয় বা অপরিণামশীল বস্তুর জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। ইহাকে গৌতম-সূত্রে বৈ-ধর্ম্মত্ব বা বিপরীত ধর্ম্ম-দোষ বলিয়াছেন।

বিশেষ,—ক্রিয়া, গতি বা motion যে যন্ত্রের প্রতি কারণ, তদ্দ্বারা স্থির অবস্থা ধারণা একেবারেই অসম্ভব। তবে, ক্রিয়াশীল অবস্থা যাহা আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে অনুভব করিতেছি, তৎ সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং এই পরিবর্ত্তনশীল জ্ঞান দিয়া অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা ধারণা করাও অসম্ভব। অনাদিকাল পর্য্যন্ত এই দৃশ্যমান জগৎ বর্ত্তমান; ইহাতে একটা স্থির অবস্থা না থাকিলে, এই পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা থাকিতে পারে না। তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে একটা অপরিবর্ত্তনশীল অবস্থা আছে। তবে এখন আপত্তি আসিতে পারে, সেই অবস্থা বা বিষয় আমাদের জ্ঞেয় কি না? দেখা যায় জ্ঞানেন্দ্রিয় বিকাশের পূর্ব্বেও আমার আমিত্ব আমাতে বর্ত্তমান; এমন কি ক্লোরাফরম্ (ChIorofrom) ইত্যাদি করিয়া আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য নিরোধ করিলেও 'আমি' থাকি—না থাকিলে আমার জ্ঞান সম্ভব হইত না। সুষুপ্তি ত প্রত্যহই আমরা অনুভব করিতেছি। তবে প্রশ্ন করিবে—সুষুপ্তি ও ক্লোরাফরমের অবস্থায় কি আমাদের স্বরূপ-জ্ঞান হয়? একপক্ষে, আমি স্বরূপ-জ্ঞান বলিলেও কোন দোষ হইবে না, যেহেতু উভয় অবস্থাই আমার দ্বন্দাতীত অবস্থা। তবে, দেখা যায় সেখানে আনন্দ কি নিরানন্দ কিছুই অনুভব হয় না; তাহার কারণ এই

যে, ক্রিয়া-মূলক অবস্থাই আমাদের দুঃখের কারণ। নিদ্রা ও ক্লোরাফরমের দ্বন্দ্ব-রহিত অবস্থা, ক্রিয়ার আধিক্য বশতঃ হইয়া থাকে; এইহেতু তখন সুখের লেশ মাত্র থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের অবস্থায় অপেক্ষা করিবার জিনিস থাকে না বলিয়া, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া অনুভব হয় না। বিশেষ, বর্ত্তমান জন্মের সংস্কার ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারাদিরূপ আবরণ, আমার স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত করিয়া রাখে; এইহেতুই জ্ঞানের বিকাশ হয় না, আনন্দ অনুভব হয় না।

সংস্কার যে জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখে, তৎ-সম্বন্ধে বিশেষ যুক্তি ও প্রমাণ কি আছে—এ-প্রশ্ন মনে হইতে পারে। ঐ উভয় অবস্থা হইতে অবস্থান্তর হইয়া যখন আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বিকাশ হয়, তখন আমার পূর্ব্ব সংস্কার সকলই জাগে এবং ইন্দ্রিয়-জ্ঞানানুরূপ সকল জ্ঞানই প্রকাশ পায়। যদি ঐ গুলি নিহিত অবস্থায় আমাতে একেবারে অবর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে ঐ গুলির প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব হইত। ক্রিয়া বিশেষে পূর্ব্ব ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইলে অথবা অভাব হইলে, তাহার আর বিকাশ হয় না। অনেক উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখা গিয়াছে, তাহাদের পূর্ব্ব সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন সংস্কার জন্মিয়াছে। আমার ইহাও বলিবার আছে

যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানগুলি ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন হইয়া ধারণা ও জ্ঞানের পরিবর্ত্তন করে। এতদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, এই জ্ঞান দ্বারা আমরা প্রকৃত 'স্বরূপ-জ্ঞান' কিছুই বুঝি না। তবে, আমাদের বুঝিবার বিষয়—বুঝা বাদ দিলে বুঝা যায়, ইহা আমি নিম্ন-লিখিত বিষয় দ্বারা প্রমাণ করিতেছি।

'আমি' বলিলে যে জিনিসটা লক্ষ্য করা যায়, তাহা আমার বুঝা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, না হইলে 'আমি' থাকার কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। বিশেষ, বর্ত্তমান অবস্থায়—আমাকে আমি যাহা বুঝি,তাহা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের দ্বারা বুঝি বলিয়াই যেমন ভুল করিতেছি, তেমনি ব্রহ্মকেও ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে গিয়া ভুল করি। অথচ দেখিতেছি ইন্দ্রিয়াদি কিছুই আমি' না—আমার স্বরূপ আমার ইন্দ্রিয়াদি বাদ দিলে আমি অবশ্যই বুঝি। সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপও ইন্দ্রিয়াদি বাদ দিলে বুঝি। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই হইতেছে অপর বুঝান, আমাকে বুঝান নয়। এই হেতুতেই সর্ব্বদা 'আমার' 'আমার' শব্দটা ইন্দ্রিয়ের সর্ব্ব কার্য্যেই প্রয়োগ হইয়া থাকে ; কিন্তু কোন সময়েই 'আমি'তে প্রয়োগ হয় না। 'আমি'তে আমার অবস্থান করিতে হইলেই, যে যন্ত্রে 'আমার' বুঝায়, সে যন্ত্রের ক্রিয়া বাদ না দিলে 'আমি'তে অবস্থান অসম্ভব। জীবের পক্ষে

এরূপ ভাবে 'আমি' বুঝা বর্ত্তমান সময়ে অতি কঠিন বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই কেবল 'তুমি' বুঝিয়া 'আমার ও আমি' বাদ দিলেও 'স্বরূপ' অবস্থার জ্ঞান আসে, এবং সেই 'তুমি' বুঝিতে আমার চিরকাল বা অনন্ত-জন্ম-অভ্যস্ত ইন্দ্রিয়গুলিতে যোগ দিলেও দোষ হইবে না। এ-কথাটি এবার বড়দিনের সময়ে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব।

বঙ্গাব্দ—৪-৮-১৮] (৩৬) [জ

সব দিন তোমাদের তত্ত্ব-জ্ঞানের উপদেশ দিয়া চিঠি লেখা ঘটিয়া উঠে না। বিশেষ—কে প্রত্যহই গুরু-তত্ত্ব লিখিতে হয়, তাহার অন্য উপদেশ মধুর মনে হয় না। শাস্ত্রকারদের বাক্যে ও আমার বহু দর্শিতায় যাহা অনুভব হইয়াছে—তাহাতে যেন আমার সরল বিশ্বাস এই যে, জীবের যখন যে অবস্থায় বা সংসর্গে, কিম্বা দেশ-কাল-ভেদে ক্রিয়ার পার্থক্যে আত্মার যেরূপ অবস্থা থাকে, আত্মারাম সেইরূপ ভাবেই প্রকাশ পান। এই হেতুতেই 'তাঁহার' লীলাভূমি সংসারে—'তাঁহাকে' আমরা অনন্ত সময়ে অনন্ত অবস্থায় ভাবি ও অনন্ত অবস্থা দেখিতে পাই। কেবল সব ভুলিয়া যাঁহারা 'তাঁহার' এক ভাবই ভাবিতে চায়,

ভাবান্তর যাঁহাদের অন্তরে ভাল লাগে না, তাঁহারা এক-ভাবেই 'তাঁহাকে' বুঝে বা অনুভব করে। মোটকথা—'তাঁহার' সত্তা প্রাণে প্রকৃষ্টরূপে নিঃসংশয়-ভাবে যাঁহারা আত্মাতে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অবস্থার পরিবর্ত্তনেও 'তাঁহারই' পরিবর্ত্তন বুঝেন। যে পর্য্যন্ত আত্মারামকে আত্মায় নিঃসংশয়রূপে অনুভব না হয়, সে পর্য্যন্তই অবস্থা বিশেষে অবস্থান্তর দেখিয়া—অন্য বস্তু অনুভব করিয়া—সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ অনুভব করে। কিছু কাল ক্রিয়ার অতীত অবস্থায় গিয়া 'তাঁহার' প্রকৃত উপলব্ধির জন্য 'গুরু-বীজ ও মূল-মন্ত্র' করিয়া সেই প্রাণের ধনকে প্রাণের সহিত বুঝিয়া লইতে পারিলে, আর কোনও অবস্থায়ই তদ্‌ভিন্ন অন্য বস্তুর জ্ঞান আসে না।

বঙ্গাব্দ—৮-৮-১৮] (৩৭) [জ

বাবা—, আমি তোমার চিঠি পাইলেই তোমাকে চিঠি লিখি। আমার তালাস করিলেই আমি তালাস করি? না, তালাস না করিলেও তালাস করি? তুমি তালাস কর না বলিয়া খুঁজিয়া পাও না। বাস্তবিক পক্ষে, চিঠি অর্থাৎ সংবাদ দিলেও তোমার হাতে নানা জায়গা ঘুরিয়া গিয়া পড়ে—সিধাসিধি পড়ে না, তাই জ্বালা পাও। বাবা,

যদি কেহ এক দিনের জন্য এক মুহূর্ত্ত-কালও সেই ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করে, তবে কি তা'র প্রাণ আর বিষয় চায়? সে অনির্ব্বচনীয় মধুরতা পরিহার করিয়া ক্ষণস্থায়ী দুঃখের নিদানভূত অকিঞ্চিৎকর সুখ কি কেহ চায়? এ-রূপ না হইলে কি ঋষিরা নির্জ্জন অরণ্যে, পর্ব্বত-গহ্বরে থাকিয়া দীন-বন্ধু—অনাথ-বন্ধু—বলিয়া দিনাতিপাত করিতেন? দৃশ্যমান জগতের অপর সকল জ্ঞানই সেই জ্ঞানের বিরোধী, সেই আনন্দের বিরতিদায়ক; এই জন্যই যেখানে গেলে দৃশ্যমান জগতের জ্ঞান অতি অল্পই অনুভব হয়, সেই খানেই ঋষিরা থাকিতেন। পরে যখন জগন্ময় ব্রহ্মের রূপই দেখিতেন, তখন আর ভাল-মন্দ ভেদাভেদ কিছুই থাকিত না। সকল এক দেখিলে জ্ঞান কেমন করিয়া ভিন্ন থাকে? লাভালাভ, জয়াজয়, আসক্তি-অনাসক্তির কার্য্যই বা কেমন করিয়া সম্ভবে? ঐ দেখা—অর্থাৎ বিভিন্ন জ্ঞান সত্ত্বে এক ভাবা, একটা theory মাত্র; practically অন্য রকম হয়।—আমি বড় বাপের বেটা এ-পরিচয় দিতে কে না চায়? তবে তুমি রাজা হইলেও আমার অভাব থাকিবে। যেহেতু মহারাণীর রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না, তথাপিও সে রাজত্ব রক্ষা করিতে অস্ত্র-শস্ত্র ও লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণ হত্যা আবশ্যক করে। যে শক্তিতে বুদ্ধদেব বিনা অস্ত্রে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ জয় করিয়া

গিয়াছেন, সেইরূপ শক্তি সম্পন্ন বাবা হইলে আমার বাবার অভাব পূরণ হয়। কারণ, সৃষ্টি যত কাল আছে, ততকাল বুদ্ধদেব থাকিবেন; কিন্তু পৃথিবীর রাজারা অল্প-কাল স্থায়ী। পঞ্চম জর্জ্জের পূর্ব্বে কে রাজা ছিলেন বলিতে পার কি? যদিও তাহা পার, তাঁহার শত জন পূর্ব্বে যিনি রাজা ছিলেন তাহার নাম কি? ভারতের কি পৃথিবীর অপর স্থানের লোকেরা কি করিয়া জানিবে? জয়ের পক্ষে সত্য যেরূপ ব্রহ্মাস্ত্র, অন্য অস্ত্র দ্বারা সেইরূপ করা যায় না। সমস্ত সসাগরা পৃথিবী জয় করিলেও নিজকে নিজে জয় করা যায় না। যেহেতু সত্য ভিন্ন বৃত্তি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য আদি জয় হয় না; ইহার অধীন থাকিতেই হয়। যে নিজে অধীন তাহার আবার স্বাধীনতা কোথায়? রাজারাও স্ত্রী, পুত্র, কন্যার বশবর্ত্তী—অর্থাৎ অধীন, কিন্তু যে সত্য স্বরূপ ব্রহ্মাস্ত্র হৃদয়ে নিয়া আপনাকে আপনি জয় করিয়াছে, সে কাহারও অধীন নয়। বাবা, আজ কাল বড় গোলমালে পড়িয়া গিয়াছি, তাই তোমাকে এ-কথা ও-কথা লিখিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছি। বহু মা বাবার এক সন্তান হইলে, সে দুর্ভাগার কপালে সুখের প্রত্যাশা অরণ্যে রোদন মাত্র। তোমার অবস্থা সর্ব্বদা লিখিলেই আমি উত্তর লিখিব। মা'কে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবা। হঠাৎ

সাংসারিক সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে একটা গোলযোগ বই আর কিছু ঘটিবে না। সহজে মীমাংসা হওয়া অপেক্ষা গোল বাধাইয়া মীমাংসা করাটা আমি যেন উচিত মনে করি না।

বঙ্গাব্দ—৪-৮-১৮] (৩৮) [সু

তুমি ক্রমে ২।৩ খানা পোষ্ট-কার্ডে 'গুরু-তত্ত্ব' বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য লিখিয়াছ। বৎস! আমার কর্ম্ম গুণে তোমারও কি আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিল? শঙ্কর তাঁহার গুরু-গীতায় গুরু সম্বন্ধে যতগুলি কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথাই আদি-অন্ত-রহিত বিশেষণ; এবং সেইরূপ বিশেষণ দিয়া "তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া বাক্য শেষ করিয়াছেন। তিনি দিগম্বর; তোমার 'বসন'* বসনে আবৃত থাকিয়া সেই গুরু-তত্ত্ব কি বুঝিয়াছে এবং তোমাকে কি বুঝাইবে? যাহা বুঝ থাকিতে বুঝা যায় না, তাহা বুঝাইয়া কেমন করিয়া বুঝান যায়?

তবে এক মাত্র তোমাকে বলিতেছি—যে বুঝ এই জগতের সমস্ত অনর্থের হেতু, সেই বুঝ রহিত হইবার

* ঠাকুর পূর্ণানন্দ স্বামীর পিতৃদত্ত নাম—'বসন্ত কুমার'

এক মাত্র উপায় 'গুরু'। যে বুঝে নাম-রূপ ভিন্ন অন্য কিছু বুঝা যায় না, সেই বুঝ 'গুরু' শব্দেই অভাব হয়। যে ইন্দ্রিয়ের বুঝে 'দেহ—আমি'-জ্ঞান আনিয়া দেহীর জন্য, অর্থাৎ দেহ-বিশিষ্ট জীবের জন্য আমরা মুগ্ধ, সেই বুঝ 'গুরু'-চিন্তা ভিন্ন অভাব হইবার নহে। যে বুঝে সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ আদি দ্বন্দ্ব-ভাব আনয়ন করে—সেই বুঝ, বুঝিয়া অভাব করিতে গেলে, আর কোন উপায়েই অভাব হইবে না। জগতে এমন দ্বিতীয় শব্দ কিছু নাই, যে শব্দে মন ও ইন্দ্রিয়ের বিলয় হয়। আমি এ-পর্য্যন্ত এক 'গুরু' ভিন্ন আর যাহা কিছু ভাবিয়াছি, সেই সকল ভাবের মধ্যেই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ক্রিয়া বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয়াতীত-জ্ঞান কেবল ঐ এক-জ্ঞানেই ক্ষণকালের জন্য অভাব হইয়াছে দেখিয়াছি। বিশেষ, ব্যাপ্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত রূপ দেখি, সকল রূপেই আমার অভিমান বৃদ্ধি হইয়া আমার ক্ষুদ্রত্বের কারণ হয়; কেবল গুরুর রূপেই আমি 'তাঁহাকে' গুরু দেখি, আমি লঘু হই এবং আমার স্বরূপ বুঝি। আমার অভিমান ও মোহ বিনাশ হইয়া আমি জগৎ-ব্যাপ্ত হই। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় যত অনুসরণ করিয়াছি, সকল উপায়ের মধ্যেই আমার বুদ্ধিমত্তা আছে।

তোমরা গুরু-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য লিখিয়াছ। যখনই বুঝের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা পাই, তখনই দেখি

আমি 'গুরুর' কিছুই বুঝি নাই—ইহা তোমাকে স্বরূপ কথা বলিতেছি। আর যখন 'বুঝান ও বুঝি' বাদ দিয়া বুঝি, তখন যাহা বুঝি তাহাও বুঝাইতে পারি না। তবে বল কি বুঝাইব? যখন নিজে বাহিয়া-ছাইয়া কূল-কিনারা পাও না, নিজের অক্ষমতা অনুভব হয়, অহং অভিমানটা কতক খর্ব্ব হইয়া পড়ে, তখন একটু ব্যাকুল হইয়া 'গুরু—গুরু' বলিয়া কাঁদিয়া দেখিও, কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ!! বিষয়-ভাবে 'তাঁহাকে' ভাবিতে গেলে বড়ই নীরস কর্কশ বোধ হয়—কারণ, 'তাঁহাকে' ভাবিলেই বিষয় অভাব হইতে চায়; বিষয়ীর বিষয় বিয়োগে যাতনা আসে। যে দিন প্রাণ ভরিয়া 'তাঁহাকে' ডাকিতে ইচ্ছা হয়, 'তাঁহার' নাম নিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, সে দিন নিশ্চয় বুঝিবে বিষয়-বিরতি আসিয়াছে—অর্থাৎ প্রাণ বিষয় চায় না। আর যে দিন ডাকিতে গেলে প্রাণ আকুল-ব্যাকুল করে, সে দিন বুঝিবে প্রাণ বিষয় চায়; প্রাণ প্রাণারামকে চায় না,—বিষয় চায়।

'তাঁহাকে' কি বলিয়া বুঝাইব? জগতে দ্বিতীয় শব্দ নাই যে, ঐ শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ করিয়া 'তাঁর' অণু মাত্র অনুভব করাইব। তবে বলিবে প্রত্যেক শব্দই ত ঐ-রূপ; এক শব্দ বলিয়া আর এক শব্দের রস পাওয়া যায় না। আমি বলিব—চিনি না বলিয়া সন্দেশ বলিলেও

মিষ্টি লাগে, বাবা না বলিয়া বাছাধন বলিলেও সুখ পাই; কিন্তু 'গুরু' বলিয়া যে সুখ পাই—তাহার অনুরূপ দূরে থাকুক, কণা-মাত্রও অন্য শব্দে পাই না। কারণ, প্রকৃতিজ শব্দে যে কোন শব্দ করি, প্রকৃতির কোন না কোন অবস্থা প্রকাশ করে—; কিন্তু 'গুরু-শব্দ' প্রকৃতির অতীত-কারী; আর কোনও শব্দেই প্রকৃতির অতীত করে না—প্রকৃতির অনুরূপ কোন না কোন একটা বুঝায় বা করায়। সুতরাং 'গুরু' শব্দের মাহাত্ম্য 'গুরু' শব্দ ভিন্ন তোমাকে আর কি দিয়া বুঝাইব? আমি তোমাকে যত কথাই বলি, ঐ এক কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে হইবে; দ্বিতীয় কথা দ্বারা হয় না।

বঙ্গাব্দ—৪-৮-১৮] (৩৯) [ন

বাবা! তুমি ও·· উভয়েই আমার নিকট গুরু-তত্ত্ব শুনিতে চাহিতেছ। তোমাদের চিঠি পাইয়া আমার বোধ হইল, তোমাদের ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে। বাপু হে—কোন রকমে একটা লোক খোসামুদি করিবার পাইয়াছিস্, কু-বুদ্ধি-বশে হারাইস্ না। আমি যদি গুরু-তত্ত্ব তোমাদের বুঝাইয়া দেই—তবে কি আমার কোন বুঝ থাকিবে?

আমার কোন বুঝ থাকিতে কি আমি গুরু-তত্ত্ব বুঝাইতে পারি? গুরু-তত্ত্ব কি, বুঝিয়া বুঝান যায়? না, বুঝিলে বুঝাইবার বুদ্ধি থাকে? গুরু-তত্ত্বের চরমে কোন কথাই নাই, সুতরাং বুঝাইবে কে, এবং বুঝিবেই বা কি? তবে যদি বুঝিবার জন্য পাগল হইয়া থাক, তবে সব বুঝ বাদ দেও, নিশ্চয় বুঝিবে; অথবা বুঝা-বুঝি ছাড়িয়া দিয়া প্রাণ ভরিয়া 'গুরু-গুরু' করিয়া দেখ, যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিবে। ইহা কথা দ্বারা বুঝাইতে গেলে কিছু মাত্র বুঝান যাইবে না। আমি না বুঝিয়া কতক ভাল আছি। আমার অমুক, আমার অমুক, আমার ক্ষেপা—বুঝি, আর কতই সুখ পাই ও দুঃখও পাই। আমি সুখ-দুঃখ-বিশিষ্ট জীব; দুঃখের সহিত অপেক্ষা করিয়া সুখ না বুঝিলে, সুখ বুঝি না; আমি কেমন করিয়া অপেক্ষা-রহিত সুখ বুঝিব? আর বুঝিলেই বা কা'রে বুঝাইব? বুঝাইবার লোক থাকে কৈ? শব্দই বা আর দ্বিতীয় কি আছে, যাহাতে প্রকৃতির অতীত সুখে লইয়া যায়? প্রকৃতিজ সুখের কত শব্দই আছে—বাবা, বাছা, মামা, মাউসা, পিসা,—কত শব্দেই কত রকমের সুখ পাই। প্রকৃতির অতীত সুখ ত এক শব্দ ছাড়া দ্বিতীয় শব্দে পাই না। তবে—কি শব্দ দিয়া 'গুরু'শব্দ বুঝাইব? নিরবচ্ছিন্ন 'গুরু-গুরু' বলিয়া যদি গুরুই' বুঝি, তবে বাবা তোমাদিগকে আর বুঝিব না।

তোমাদের দু'জনের ঘাড়ে ভূত চাপিয়া কেন এ কু-বুদ্ধি জন্মিল ? আমার এ 'বাবা' ডাক কি আর মধুর লাগে না ? আমার 'বাছা সোনাধন' কি কর্ণে কণ্টক বিদ্ধ করে ? এই জন্যই কি আমার পিছনে লাগিয়াছ ? বাবা যেরূপ জীব, গুরু ত সেইরূপ ভাবেই আহ্বান করিতেছেন ; ভাবের বিপরীত আহ্বান কি শ্রুতি-মধুর হইবে ? তবে শুন, কেবল 'গুরু— গুরু—গুরু—গুরু— গুরু—' ; কেমন, ভাল লাগিল কি ? বোধ হয় কর্ণে প্রবেশও করে নাই, মনেও ধারণা হয় নাই, চক্ষুতেও অন্ধকার দেখিতেছ, নাকের ভিতর পূতি-গন্ধ প্রবেশ করিতেছে, রসনা জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, স্পর্শ, অগ্নির ন্যায় স্পর্শ করিতেছে—এ-কথা কি সত্য ? ইন্দ্রিয়ের কার্য্য শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ; মন ইন্দ্রিয়ের সংস্কার মাত্র। সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত শব্দে ইন্দ্রিয়ের ও মনের সুখ কিরূপে সম্ভবে ? তাই যতকাল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে, তত কাল জীব যে ভাবেই যাহা ভাবুক না কেন,– মা, বাবা ইত্যাদি ভাবে ভাবনা করে। সেই ভাবাতীত ভবের আধার ভগবান্‌কেও মা—মা, বাবা বলিয়া ভাবে। 'গুরু' বলিয়া ভাবিতে গেলেই ভাবের অভাব হয়, ভাব-বিশিষ্ট-জীবের নীরস কর্কশ বোধ হয়। এই জন্যই চিঠিতে কেবল 'গুরু—গুরু—গুরু—গুরু—গুরু' বুঝাইতে গিয়া এ-শব্দ

যায় না। ভাব অনুরূপ মা, বাবা, বাছাধন, বৎস ইত্যাদি শব্দ যায়। এই মা-বাবার মধ্যেও কিছু বিশেষত্ব থাকে এবং একটা বিশেষত্ব দিয়া অন্য (জাগতিক) মা-বাবা-জ্ঞান রহিত করিবার জন্য, গুরু জাল পাতিয়া মা-বাবা বলেন। 'তাঁহার' অপার করুণা—যদি 'তাঁহার' জাল পাতার সঙ্কেত কেহ বুঝে, তবে সে বুঝিবে। বৎস—বাবা! আমাকে ত কেহ চায় না, কেহ চাহিবেও না। চোখ্ থাকিতে আমাকে কেহ দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিতে আমার শব্দ শোনে না, আঘ্রাণ থাকিতে আমার গন্ধ পায় না, স্পর্শ থাকিতে আমার স্পর্শ অনুভব করে না। তবে যদি রসনা থাকিতে ডাকিতে বাসনা জন্মিয়া থাকে, তবে আর কিছু না বলিয়া কেবল 'গুরু—গুরু—'বল। বৎস! কিছুতেই 'গুরু—গুরু'—বলিয়া স্থির থাকিতে পারিবে না, তাই বলি মনের সাধে এম্-এ-র পাঠ্য পড়িয়া লও; এম,-এ,পাশ করিয়া সংসারের গুরুত্ব বুঝিয়া লও। তার পর কেবল 'গুরু—গুরু—'ধ্বনি শুনাইব; যেন গুরুত্বের দিকে প্রাণ ধাবিত না হইয়া 'গুরুর' দিকেই প্রাণ ধাবিত হয়। তথাপিও যদি না শোন,তবে আমি 'গুরু—গুরু—'বলিয়া নীরব হইব। তোমার নীরব হইবার শক্তি না থাকিলে, নিজের রব ভুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জাত-বুলি বলিব।

বঙ্গাব্দ—৪-৮-১৮] (৪০) [প

বাবা! এই কয় দিন বড় অস্থিরতার সহিত দিনাতিপাত করিয়াছি। অনেক সময়ই ভাবি অস্থিরতায় ফল কি, কিন্তু প্রাণ বুঝে কৈ? বুঝিয়াছিলাম, বুঝাইতে বুঝাইতে ক্রমে 'না-বুঝ' হইবে। কর্ম্ম-জ্ঞানে বুঝা-বুঝি বৃদ্ধি পাইয়া আমাকে ভাল রূপেই বুঝাইতেছে, তবু বুঝি কৈ? এ সংসার বুঝা-বুঝির মূলেই; আবার বুঝা-বুঝির মূলেই দুঃখ। তবে কি বুঝা-বুঝি এত দুঃখানলেও দগ্ধ হয় না? তাহ'লে বুঝের অবসান কিসে হইবে? যাহাতে অবসান হইবে—'তাঁহাকে' ভাবিবার সময় কৈ? আমি ত অমুক ও অমুকের চিঠি লিখিয়াই ব্যস্ত; তাহারা আমার জন্য ব্যস্ত কৈ? আমি ত অমুকের সুখের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু সুখের বাসনায় দুঃখ বৈ অন্য ফল প্রসব করে কৈ?

অনেক সময় ভাবিয়া দেখি, আমি কি আমাতে, না অন্যে; যখনই আমি আমাতে, তখই আমি 'গুরু' বুঝি। 'গুরু' যখন অন্যে তখন 'গুরু' কৈ? 'গুরু' ছাড়া ত অন্য কিছুই নাই, তবে অন্য বুঝাই ত 'গুরু' ভিন্ন অন্য বুঝ। এ-অবস্থায় 'গুরু' যে 'গুরুতে' আছেন, এ-টা তোমাদের ভ্রান্তি। শিষ্য-বোধ আসিলে গুরু-জ্ঞান কি সম্ভবপর?

তবে শিষ্য হইলে 'গুরু' বুঝে, গুরু হইলে 'গুরু' বুঝে না। বিশেষ—গুরু,'গুরু'বুঝিলে—'গুরু' থাকেন না, শিষ্য হইয়া যান। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হইলে এ-বিষয়টা পরিষ্কার বুঝিবে না। গুরু যখন 'গুরু' তখন দ্বিতীয় বস্তু দেখেন না, কেবল 'গুরুই' দেখেন। দ্বিতীয় বস্তু বোধ হইলেই আর গুরু, 'গুরু' থাকেন না।

বঙ্গাব্দ—৬-৮-১৮] (৪১) [স্থ

গত রাত্রিতে গুরু বলিলেন—আমি তো 'গুরু'বুঝি নাই কারণ, নিজকে নিজে কেহই বুঝে না, অপরকে বুঝে, অর্থাৎ গুরু শিষ্যই বুঝে। কোনও শাস্ত্রে কি আছে যে, শিষ্য ভিন্ন গুরু গুরুকে বুঝিয়াছেন? আমি ত গুরু, আমাকে আমি বুঝি না; তুমি আমাকে কি বুঝিয়াছ? বল শুনি। তুমি কি গুণে আমাকে দয়ার-সাগর বুঝিয়াছ? আমি ত তোমার সব হরণ করিতে উদ্যত। তুমি কি গুণে আমাকে ভব-কাণ্ডারী বলিতেছ? তাহা হইলে ধর্ম্ম-ভূমি ভারত পাতকী-পরিপূর্ণ কেন? তুমি কোন্ গুণে আমাকে পতিত-পাবন বলিতেছ? ভারতের মত পতিত কোথায় আছে? তুমি কোন্ গুণে দীন-তারণ বলিতেছ?

ভারতের মত এমন দীন-সন্তান আর কি কোথাও সম্ভবে? যেখানে বসুন্ধরা নানা শষ্য-পরিপূর্ণা, অথচ লক্ষ লক্ষ প্রাণী অন্ন কষ্টে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে !! 'তোমাকে' কি বলিয়া মঙ্গলময় বলি ? মঙ্গলামঙ্গল কোনও জ্ঞানই ত তোমাতে নাই। তুমি কোন্ বাক্যের মধ্যে আছ, যাহা দিয়া তোমার স্তব করিব ? তুমি কোন্ ক্রিয়ায় বিরাজমান, যে ক্রিয়া ধরিয়া তোমায় ধরিব ? তুমি সন্তোষ-অসন্তোষ-রহিত—কি দিয়া পূজা করিয়া তোমার সন্তোষ বিধান করিব ? তুমি সর্ব্বময়—তবে তোমার পূজাই বা কে করিবে ? তুমি আমার প্রাণের প্রাণ - তবে তোমায় দিবার কি আছে ? তুমি আমার মনের মন, শক্তির শক্তি,— তুমি ছাড়া আমি কই ? তবে তুমি ছাড়া আমি ও আমার যা' আছে, তা' দেওয়া-বই আমার আর দিবার আছে কৈ ? তা' দিলেই বা আমি থাকি কৈ ? তবে আমায় এই করিয়া দেও, যেন আমি যা' করি -- তা' তোমার করি ; আমি যা' ভাবি - তা' তোমারই ভাবি, আমি যা' বুঝি—তা'তে তোমাকেই বুঝি, আমার যা' চিন্তা—তা' তোমারই চিন্তা ; আমার যা' সেবা বা পূজা—তা' তোমারই পূজা। তুমি ছাড়া আর আমি যেন না থাকি—স্তব-স্তুতি-শিক্ষা-উপদেশ সমস্তই এই। ইহা ভিন্ন অন্য হইলেই তুমি আমি অন্য বা ভিন্ন।

এ দিকে তোমার ঘরই করিব, না তোমার কথা তোমায় বলিয়া তোমায় সন্তোষ করিব? তোমার স্তুতি করিলে তুমি সন্তুষ্ট, না বড় দিনের পূর্ব্বে তোমার ঘরখানা উঠাইয়া রাখিলে তুমি সন্তুষ্ট? তোমার এ-ধার ও-ধার দুই ধার হইলেই আর আমি ঠিক থাকি না; সব ছলনা বুঝি। ছলনায় তোমা হইতে বঞ্চিত হই। 'গুরু' আমি ইহা বই আর বুঝি না। অন্য বুঝা-বুঝি আমার পক্ষে জ্বালাদায়ক; আমাকে অস্থির করে, আমার ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ সব আসিয়া পড়ে,—ভাল-মন্দ বিচার আসিয়া আমাকে স্রোতে ভাসাইয়া নেয়।

এতক্ষণ কা'র সন্তোষের জন্য, কা'রে স্তুতি করিতেছিলাম? তুমি কি সেই গুরু-ভক্তের গুরু হইয়া আমাকে মুক্ত করিবে? এবং ভারত মুক্ত হইবে। আমার মুক্তি হইলে ভারতে পতিত কে থাকিবে? বাবা! তুমি উপযুক্ত পাত্র ধরিয়াছ, এরূপ ষণ্ডামার্ক পার করিতে পারিলে আর কেহ পতিত থাকিবে না। তাই রাত দিন তোষামদ করি,—তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার মন, তুমি আমার জীবন, তুমিই আমার শেষের দিনে নিদানের বন্ধু। * *

বঙ্গাব্দ ৮-৮-১৮] (৪২) [সু

তুমি যে লিখিয়াছ—"পাশ্চাত্য দর্শনকারেরা এক একটা সত্য নিরূপণে এক একটা theory অবলম্বন করেন, সেই theoryতে মানুষের হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখাদি হওয়ার বাধা থাকে কি"? কিন্তু যে theoryতে হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ অতিক্রম করা যায়, সে theoryটা মন্দ কি? যে theoryতে এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-জ্ঞান জন্মিয়া আপন-পর, ভাল-মন্দ ইত্যাদি ভেদাভেদ জন্মাইতেছে, সেই theoryটা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল এক জ্ঞানে এক বুঝিয়া হর্ষ-বিষাদের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারিলে, সেই theoryতে দোষ কি? বিশেষ, রাত্রি-দিন কেবল 'বুঝি না' বুঝিব, 'পাই নাই' পাইব, ইত্যাকার ভাবের অভাব যে theoryতে করে, সে theoryটা আমি ঠিক বুঝি; কারণ, ঐ theoryতে বেঠিক বুঝিবার আর একটা থাকে না। যত-ইতি গোলমাল এই 'দুইটা' বুঝিয়া—theoryও বুঝি ঐ 'দুইটা' আছে বলিয়া। 'দুইটা' চলিয়া গেলে theory বুঝিবে কে?

তবে তুমি বলিবে 'দুইটা' না বুঝিয়া একটা বুঝা এ-কথাটাই theory। তৎপক্ষে আমি এই বলিতেছি যে,

প্রতিনিয়তই আমাদের এক ভাব অপর ভাবের অভাব করে এবং ভাবাভাব-রহিত অবস্থায়ও আমরা কতক সময় অবস্থান করি,—যথা সুষুপ্তিতে। সুষুপ্তিটাকে theory বলিলে চলিবে কেন? তবে, বলিবে নিদ্রা চিরকাল স্থায়ী নয়, অভ্যাস-মূলে নিদ্রাকালেরও তারতম্য দেখা যায়। কয়েক বৎসর গত হইল ইউরোপে এরূপ একটা লোকের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সে ১১ মাস ঘুমায়। ক্রিয়া-মূলক-জ্ঞানে এ-জগৎ-জ্ঞান, এ-ভাল-মন্দ-জ্ঞান, এ-জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় ভেদ হয়; ক্রিয়ার মধ্যেও অ ই-উ-ঋ-ঌ শব্দ ভেদে এক প্রকার ক্রিয়া ভেদ এবং আবার ক-খ-প-ফ ভেদে অন্য প্রকার ক্রিয়ার ভেদ দেখা যায় এবং হ্রস্ব-দীর্ঘতা ভেদেও ভাবের ভেদ দৃষ্ট হয়। হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে যখন শব্দেরও ভেদ হয়, তখন হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাত অনুসারে সুখ-দুঃখের ভেদ হইবেই হইবে, যথা ক্রোধ, হিংসা, কাম, লোভ ইত্যাদি বৃত্তির ভেদ হয়। তোমাদের ইংরাজী দর্শনেও এই vibration theory স্বীকার করে। জগতে রাত-দিনই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, সেই বৈষম্যের হেতুটাকেই আমরা ক্রিয়া বা vibration বলিতেছি।

এই পরিবর্ত্তনের হেতুটাকে, তুমি তোমার রুচি অনুসারে theory না বলিয়া অন্য কিছু বলিলেও আমি রাজী আছি। তবে তোমাকে আমি এই বলিতেছি যে,

তোমাকে যে 'গুরু-গুরু' করিতে বলিয়াছি, উহাকে তুমি theoryতে না বুঝিয়া practically করিয়া দেখ, তাহা হইলেই তুমি practically বুঝিবে। করিয়া দেখার নাম practical, তুমি করিয়া দেখ তাহা হইলেই practically বুঝিবে—এ আমার সত্য সাক্ষ্য এবং প্রতিজ্ঞা করা বাক্য।

তবে এক কথা,—আজ আমার প্রবল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—আমি তোমাদের বাক্য-ভাষায় "ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং" বুঝাইতেছি.—আমার হর্ষ-বিষাদাদি সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছ; ইহাতে কি তোমার সন্দেহ আসিয়া এ-টাকে theory বলিয়া বুঝিতেছ? তবে আমার নিকট হইতে চিঠি-পত্র চাহিও না, আমাকে 'গুরু-গুরু' করিতে দেও—তোমাকে practically বুঝাই; তা'তে কি রাজী আছ? তাহা হইলে এ-টা যে practical,—theory নয়, নিশ্চয়ই বুঝিবে।

তুমি প্রথমে theory না বুঝিলে কি practically বুঝিতে চেষ্টা করিবে? এই জন্যই তোমাকে theory বুঝাইয়া practically করিয়া দেখার জন্য যত্ন নিতেছি; ইহাতেই তোমার theory বোধ হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, বুঝা-বুঝিই theory; বুঝা-বুঝির অতীতে গেলে practical; বুঝা-বুঝি থাকিতে theoryই বুঝিবে; কারণ, বুঝার জিনিসটাই theory।

বড় দিনের বন্ধে দোতালায় বসিয়া theory বুঝিবার জন্য ৩।৪ খানা চিঠি পাইয়াছি; কাযেই আমি তোমার theory বুঝাইতে পারিলাম না। আমি ঘর theory বুঝিবার পর, practiclly বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। নীচে ৮।৯ জন মিস্ত্রী *** এজন্য আজ practical ও theoritical-এর পার্থক্য ভাল রূপে বুঝাইবার সময় পাইলাম না।

বঙ্গাব্দ—১১-৬-১৮] (৪৩) [সু

তুমি লিখিয়াছ—'চিঠি খানি আয়তনে ক্ষুদ্র' আয়তনে বড় হইলে 'গুরু-গুরু' শব্দ অনেক বার শুনিতে। ** চেষ্টা করিয়া দোতালাখানা তৈয়ার করা যায় কি না সেই চেস্টায়ই অস্থির; 'গুরু-গুরু' করিবার অবকাশ কই? আর এত প্রবল বিষয়-ব্যাপারে মনোযোগ থাকিতে 'গুরু-গুরু' আসিতেই বা অবকাশ কই? আসিলেই বা মিষ্ট লাগিবে কেন? আমার ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়ার শব্দ না বলিয়া ক্রিয়ার বিপরীত শব্দ আমাকে কে বলাইবে? যা'র ভরে বলিব, সে যে কল্পনা-বলে মুহূর্ত্তের মধ্যে দোতালা, তেতালা, বালাখানা, শূন্যে গন্ধর্ব্ব-নগর স্থাপন করে। আমি কি

নিজ ইচ্ছায় বা স্বাভাবিক নিয়মেই গুরু বলি? গুরু বলায় বলিয়া বলি। আমার স্ব-ভাব যাহা, তাহাই আমাকে স্বভাবে বলায়; আমি স্ব-ভাবে না গেলে, স্বভাবে কি আমাকে 'গুরু' বলাইবে? গুরু বলা ত প্রকৃতির কার্য্য নয়; আত্মার কার্য্য। আত্মা প্রকৃতি যোগে যখন অনাত্ম-পদার্থে আত্মা দেখেন, অথবা আত্মাকে অনাত্ম-পদার্থ মনে করেন, তখন গুরু বলা তাহার ধর্ম্ম নয়। যতক্ষণ আমি লঘু এ-জ্ঞান না আসিবে, ততক্ষণ গুরু বলিবে না।

আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ক্রিয়ানুরূপ সংস্কার নিয়া জন্ম গ্রহণ করি এবং জন্মিবার পরও স্ব স্ব ক্রিয়ানুরূপ সংস্কার জন্মে; যে পর্য্যন্ত ঐ ক্রিয়া ফলের দোষ ও গুণ আমার অনুভব না হয়, তত কাল পর্য্যন্ত আমার ক্রিয়ার বিপরীত শব্দেতে আসক্তি কেন আসিবে? অর্থাৎ জন্মান্তরীন ও বর্ত্তমান সংস্কারানুরূপ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া, ঐ কর্ম্মের যাতনা ও সুখ এই উভয় অবস্থা উপভোগ না করিলে, যে কর্ম্মে যে দোষ বা গুণ আছে তাহা বুঝাইতে গেলে বুঝিবে কেন? কেবল সংস্কারানুরূপ কর্ম্মের স্পৃহাই প্রবল থাকিবে। ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক বালককে যদি বুঝান যায় যে, স্ত্রী দ্বারা সময়ে সময়ে নানাপ্রকার যাতনাও পাইতে হয়; পুত্রাদি

জন্মিয়া, পুত্রের ব্যাধি-পীড়া জন্মিলে, পিতার অত্যন্ত কষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে কি পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার-জনিত অথবা বর্ত্তমান জন্মের ক্রিয়া-জাত স্ত্রী গ্রহণের স্পৃহা ও পুত্র-কন্যার আকাঙ্খার হাত হইতে রক্ষা করা যায়? আকাঙ্খার প্রবলতায়, স্ত্রী ব্যবহারে যাতনা ও পুত্র-কন্যার কষ্টে কষ্ট, ইহা উপদেশ শুনিয়া কিছু মাত্র অনুভব করা যায় না; বরং উপভোগের দ্বারা কষ্ট-যাতনা অনুভূত হইলে, তখন কষ্ট-যাতনার কথা বলিলে, প্রাণে কতক ধারণা হইয়া বিরতির কারণ হয়। তদবস্থায় ইহা অপেক্ষা দুঃখ-রহিত সুখের এক মাত্র কারণ 'গুরু' ইহা বুঝাইলে কেহ বা বুঝিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ এমনই সংস্কারাবদ্ধ হয় যে, উহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় বুঝে না, সুখ-দুঃখ হইলেও তাহাতেই থাকিতে চায় যেমন নাকি, যত কষ্টই হউক না কেন—আমরা মরিতে চাই না। সে রূপ ব্যক্তির পক্ষে 'গুরু' শব্দ কোন সময়েই গুরু নহে। তবে অবস্থা, স্থান ও কাল ভেদে ইহার সকল অবস্থারই ব্যভিচার সম্ভব।

ও! এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—···র গুরুকে দোতালায় দেখিতে ইচ্ছা, আর নীচের তালায় দেখিতে ভাল লাগে না। পূর্ব্বে যখন দোতালা ঘর উচিত কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন বলিয়াছিল 'আমি আবশ্যক

মনে করি না ; সে-কথাটাও আজ বুঝিয়াছি। সে সময়ে ...গুরুকে সব তালায়ই দেখিত ; এখন তেতালা হইতে দোতালায় না থাকিলে দেখা যায় না, দেখিলেও ছোট দেখায় (অতি উচ্চ স্থান হইতে নীচের বস্তু ক্ষুদ্র দেখা যায়)। এজন্য গুরু এবার দোতালায় উঠিয়া 'গুরু-গুরু' করিবেন যে তত ক্ষুদ্র না দেখে এবং শব্দটা কর্ণে প্রবেশ করে।

যে শব্দটা গুরু, তার ব্যাখ্যা অন্য কোন্ শব্দ দ্বারা সম্ভব ? আর সব শব্দই ত গুরু শব্দ হইতে লঘু ; কেননা কোন শব্দই শব্দের অভাব করে না, কেবল ঐ এক গুরু-শব্দেই সব শব্দের অভাব হয়। শব্দের অভাব হইলে বলিবার কি থাকে ? এজন্য তোমাকে বেশী কথা না বলিয়া এক কথাই বারে বারে বলিতেছি— "গুরু-গুরু করিয়া বলা-বলি ঘুচাও"। বলা-বলি থাকিলেই বলা-বলি থাকিবে ; বিচার-তর্ক-মীমাংসা আসিবে।

ভাল,—তোমার চিঠিতেই লেখা আছে—"গুরু বলিলে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সাময়িক নিরোধ হয় ; যতক্ষণ গুরুতে থাকা যায় ততক্ষণ অন্য কিছু থাকে না"। তবে এটা theory কোথায় ? এটা ত practical ; বরাবরই বলা হইতেছে গুরু বুঝিলে সব ভুল হয়। এখন তোমার হাতেই বিচার দেওয়া যাইতেছে—যে গুরু শব্দটায়

ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় নেয়,তাহা theoritical না practical ? theoryটা কি পৃথিবীর সকলে এক বাক্যে ঠিক বলিবে ? কোনও না কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকে। কিন্তু গুরু বলিয়া যদি কেহ দেখে, তাহা হইলে কেহ কি এ-কথা বলিবে যে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অভাব হয় না ? আর যদি theoryই বা হয়, তবে যে theory তে জ্বালা-যন্ত্রনার কিছু মাত্র অবসান হয় না, সেই theory নিয়া ফল কি ? যে theory তে আমার কোনও জ্বালা থাকে না, আমি সেই theory ভালবাসি। এ theory সম্বন্ধে পূর্ব্ব পত্রেও লিখিয়া পাঠাইয়াছি। আমি কা'রও বিচার-তর্ক কিছু শুনিতে চাই না ; গুরু-গুরুই বলিব, অন্য বোল ভুলিব, দেখিব আমার বোলে অন্য আসে কি না। অন্য আসে ভাল, অন্য না আসিলেও ভাল। অন্যই আমার অনন্য জ্ঞানের কারণ। আর যদি সকলই আমার কথায় আসে, তাহা হইলে আমি সকলের সহিত এক, তখনও আমার দ্বিতীয় নাই। এইজন্যই বলি,কেবল বল - 'গুরু-গুরু-গুরু'। বিচার-তর্কে—চিন্তানুধ্যানে—আমি নিশ্চয়ই বুঝি যে, আমি অতি লঘু ; কেবল—গুরু না বুঝিয়াই আমার লঘুতে গুরুর theory—এইজন্যই বলি, বল—'গুরু-গুরু-গুরু'। 'দোতালায়' বসিয়া মনের সাধে গুরু-গুরু বলিব ; 'নিচের তালায়'বসিয়া বলিলে শব্দের মধুরতা বুঝা যায় না।

বঙ্গাব্দ—১৩-৮-১৮ (৪৪) [স্থ

তোমার পোষ্ট-কার্ড পাইলাম। যতই চিন্তা ও অনুধ্যান করি, ততই দেখি—জীব প্রকৃতি বা ক্রিয়ার ঘোর আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইয়া, স্থির বা স্বরূপ অবস্থা একেবারেই অনুভব করিতে পারে না। যেরূপ কোন দণ্ডাগ্রে সপ্ত-বর্ণে চিত্রিত বস্ত্র বা কাগজ সংলগ্ন করিয়া উহাকে প্রবলবেগে ঘুরাইলে অন্যান্য বর্ণ কিছু মাত্র দৃষ্টি-গোচর হয় না, কেবল এক শুভ্র বর্ণই দেখায়, সেইরূপ প্রকৃতির ঘূর্ণনে, জীব প্রকৃতি অনুরূপই অনুভব করে ও দেখে, স্থির বা স্বরূপ অবস্থা কিছু মাত্র অনুভব করিতে পারে না। ঘূর্ণায়মান সপ্ত-বর্ণ-যুক্ত-দণ্ড কিছু-কাল স্থির রাখিলে যেরূপ বিভিন্ন বর্ণ দেখায়, সেইরূপ 'গুরু-গুরু-গুরু-গুরু' করিয়া জগতের গতি কিছু কাল স্থগিত করিলে জীবও স্বরূপ অবস্থা অনুভব করিতে পারে; এতদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে জগতের গতি হইতে স্থির হইবার উপায় নাই। তাহাতেও এক প্রবল আতঙ্কের কারণ বর্ত্তমান; ঘূর্ণায়মান অবস্থায় গুরু-গুরু করিয়া প্রকৃত 'গুরু-গুরু' না হইলে, গুরু-গুরুতে হয় না এ-জ্ঞান আসিবে। প্রকৃত রূপে গুরু-গুরু করিতে

হইলে, জগতের অন্য গতি নিরোধ করিয়া—'গুরু-গুরু' করিতে হইবে। সেই নিরোধের উপায় নিরন্তর সৎকার-সেবা দ্বারা 'মূল-মন্ত্র' ও 'গুরু-বীজ' করা; নচেৎ প্রকৃতির গতি অতিক্রম করিয়া গুরু-গুরু করা হয় না।

'গুরু-বীজ, মূল-মন্ত্র ও গুরু-গুরু' করা আবশ্যক বোধ না হইলে করিবে কেন? গত্যাত্মক অবস্থায়ই যাহারা সুখী এবং উহাকেই চরম ও শেষ বলিয়া মনে করে, তাহারা গতি নিরোধক গুরু গুরু শব্দ করিবে কেন? বিশেষ—গতি বা প্রকৃতি-প্রভাবে যে সব গতির পুতুল চতুঃপার্শ্বে ঘুরিতেছে, তাহাদের সহিত সংযোগ বিয়োগে সর্ব্ব জীবই ঘুরে; সুতরাং কিছু কাল স্থির না হইলে বা গতির অবস্থা মন্দীভূত না হইলে, জীবের গন্তব্য-স্থান কোথায় এবং কর্ত্তব্য কি, ইহাও অনুভব করা অসম্ভব। বর্ত্তমান অবস্থায় জীবকে গুরু গুরু করাইবার কথাটা কল্পনা বা theory বই আর কিছুই নয়। আমি যে সব চিঠি-পত্র লিখি, ঐ সব চিঠি-পত্র পাঠে যে ভাব কিছু কাল থাকে, চতুঃপার্শের গত্যাত্মক পদার্থের সংযোগে গত্যাত্মক অবস্থা পুনরায় আসিয়া পূর্ব্ব-স্মৃতি বিলোপ করে এবং ঐ অবস্থায়, ঐ নিরোধের কথা একটা কল্পনা মাত্র হয়। এই প্রকারে প্রকৃতির সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে জীবের অবসন্নতা

আসে এবং গুরু বলা আর সম্ভবপর হয় না। এই-হেতু ঋষিরা কেবল বনে, পর্ব্বত-গহ্বরে সাধনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এইহেতু শিষ্যের গুরু-সহবাস অত্যাবশ্যক বলিয়া গিয়াছেন। এইহেতু বিষয়-সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সৎ-সঙ্গে বাস সর্ব্ব শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

গুরু গুরু কার কাছে মধুর? যে জানে যে, মৃত্যু ধ্রুব সত্য; যে জানে এই সংসারের আত্মীয়তা ক্ষণস্থায়ী এবং অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য; গুরু-সেই ভালবাসে। গুরু-গুরু সে-ই ভাল-বাসে—যে বুঝিয়াছে, ইন্দ্রিয়-সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং তজ্জন্য অপার দুঃখ ভোগ করিতে হয়। গুরু-গুরু কা'র কাছে মধুর? যে জানে যে—গুরু-গুরু ভিন্ন জন্ম-মৃত্যু রহিত হয় না এবং জন্ম-মৃত্যু অতি যাতনা দায়ক। গুরু-গুরু তা'র কাছেই মধুর, যে জানে যে—এই সংসারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুখের জন্য অন্যকে চায়, অপরের সুখের জন্য কেহ কাহাকেও চায় না; এক মাত্র গুরুই অন্যের সুখের জন্য আপন সুখ বিসর্জ্জন দিয়া অন্যকে চান। গুরু-গুরু তা'র কাছেই মধুর, যে বুঝিয়াছে—এ সংসারে সকলেই ভ্রমে ভুলিয়া ভ্রমেই আছে এবং ভ্রান্ত-বস্তুতে ঠিক ধারণা করিয়া রাত-দিন অসুখ ও অশান্তি ভোগ

করিতেছে। বাবা! যে মূঢ় অজ্ঞান এই ক্ষণস্থায়ী বিষয়কে, সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ে ও আসক্তিতে আসক্ত থাকিয়া অবিনশ্বর মনে করিতেছে—যে সকল নরাকার পশু অতি ঘৃনিত নরক-জনক মল-মূত্রাধারকে পরম সুখাবহ মনে করিতেছে, তাহারা কোন্ প্রয়োজনে—কেন গুরু-গুরু করিবে? যাহারা মায়া-মোহে অন্ধ হইয়া—মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে যাহা বিনষ্ট হইতে পারে, এবং যাহা বিনষ্ট হইলে অসহ্য যাতনা পাইতে হয়—এমন পুত্র-কন্যার মোহে মুগ্ধ, তাহারা কেন গুরু-গুরু করিবে? যাহারা, জীবন বিনষ্ট হইলেই এই অহঙ্কার, অভিমান, রাজ্য, সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, ইহা না বুঝিয়া ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত, তাহারা কেন গুরু-গুরু করিবে?

তবে কা'র কাছে 'গুরু-গুরু' করিব? কে গুরুর গুরুত্ব বুঝিবে? লঘুকে গুরু বুঝাইতে গিয়া কেবল উপহাসাস্পদই হইব; তাই প্রাণ আর গুরু-গুরু বলিতে চাহে না; বলিলে প্রাণে প্রাণে বলিতে ইচ্ছা হয়। প্রাণের ধন প্রাণই বুঝুক, অন্যকে বুঝাইতে গিয়া বৃথা বিড়ম্বনায় ফল কি? বিনা প্রয়োজনে কে কোন্ কথা শুনে—শুনিবেই বা কেন? শুনা-শুনি সব প্রয়োজনানুরোধে।

বঙ্গাব্দ—১৫-৮-১৮] (৪৫) [সু

সব সময় এক ভাব নিয়া চিঠি লেখা আমার পক্ষে কঠিন। বিভিন্ন ভাবের লোকের সহিত রাত-দিন বিভিন্ন ব্যবহার করিতে হয়; আমি ঠিক একটি বহুরূপী। যখন আত্ম-স্বরূপ চিন্তা করি, তখন দেখি—আমার কোনও রূপ নাই। আর যখন নানা জনের নানা ভাবে যোগ দেই, তখন দেখি—আমার রূপের অন্ত নাই। আমি আমাকে নিয়া থাকিতে পারি কই? 'আমার' আসিয়াই আমাকে 'আমি' হইতে বিযুক্ত করে। তখন কত কথা কই, কত বুঝি, কত বুঝাই; অথচ মূলে বুঝা-বুঝির কিছু নাই; বুঝিতে গিয়া ও বুঝাইতে গিয়াই বে-বুঝ হই, বুঝের জিনিস হারাইয়া যাই। এত কালের বুঝ সহজে ভুল হইবার নয়, আবার বুঝা-বুঝির মধ্যে থাকিলে বে-বুঝ হওয়া একেবারেই অসম্ভব বোধ হয়।

কি করিব, কেবল গুরু বুঝিয়া থাকিতে পারি কই? গুরু বুঝিলেও—বুঝিয়া (বা বুঝ দিয়া) বুঝিতে চাই, যে বুঝই গুরু-জ্ঞানের অভাব-কারী, তাহা বুঝিয়া বুঝিব কেমন করিয়া? আমার আর বুঝানের ও বুঝিবার সাধ নাই; কেবল সময় অপেক্ষা করিতেছি,—'গুরু-গুরু' করিয়া বুঝের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই কি না। তবে সময় ও

কাল-জ্ঞান কাল হইয়া না দাঁড়ায়, এজন্য কালকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য গুরু নিয়া বুঝা বুঝি করি। বুঝা-বুঝি বাদ দিলে সম্পূর্ণ কালের অধীন হই, এজন্য গুরু বুঝি ও গুরু বুঝাই।

যে বুঝই ভেদ-জ্ঞান হইতে উদ্ভূত, সে-বুঝ রাখিয়া ভেদ-জ্ঞান দূর করা বে-বুঝের কায। বিশেষ—বুঝিবার কিছু নাই, তবুও বুঝিব ও বুঝাইব এমন বে-বুঝ আর কোথায় আছে? যা বুঝি তোমাকেই বুঝি, এ-বুঝের মধ্যেও চুপ করিয়া পলাইয়া বা লুকাইয়া বুঝা-বুঝি আছে। এ-বুঝের মূল উৎপাটন করিতে হইলে বুঝা-বুঝি বাদ দিয়া 'গুরু' বুঝা দরকার। গুরুও বুঝিয়া বুঝাইতে গেলে মাথা ঘুরায়, গোল বাধে, অস্থির করে, হাই উঠে, শরীর অবসন্ন বোধ হয়, আর পারি না ডাক ছাড়ে।

তবে বুঝ নিয়া বুঝিতে হইলেও, গুরু বুঝাই ভাল বটে; কিন্তু ভাল-মন্দ বুঝটা বাদ দেওয়া উচিত। কারণ, ভাল-মন্দ বিচার করিতে গেলেই তাহার অন্তরালে আর একটা কিছু থাকে। অতএব ভাল-মন্দ বাদ দিলে, কেবল 'গুরু' বুঝার মধ্যে কেহ থাকিলেও আমার জ্ঞানে অধিকার করে না, স্থতরাং তজ্জন্য আমার কোনও ক্রিয়া অর্শেনা।

বেদান্তের "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা,"—ইহার মধ্যে প্রশ্ন-কারী ও ব্রহ্ম দুই ব্যক্তি থাকে, তৃতীয় ব্যক্তির নিকট

প্রশ্ন হয়—এইহেতু বেদান্ত পড়িয়া ভেদ-জ্ঞান রহিত হয় না। যখন প্রশ্ন থাকে না, যখন জিজ্ঞাসা ও জিজ্ঞাস্য থাকে না, থাকা,না-থাকাও থাকে না, তখন অভেদ-জ্ঞান। সেইরূপ গুরু-জ্ঞানও গুরু ভিন্ন অন্য কিছু থাকিলে জন্মিবে না। তবে, নাই মামা হইতে কানা মামা ভাল—এজন্যই—'আমি' আর 'গুরু' থাকিতে পারিলেও গুরুর আংশিক জ্ঞান হয়। সেই আংশিক জ্ঞানেই আমরা 'তাঁহাকে' দয়ার-সাগর, পতিত-পাবন, দীন-বন্ধু, কৃপা-সিন্ধু ইত্যাদি বলিয়া থাকি।

তোমাকে যে যে অংশে গুরু বুঝা বলিতেছি - সেই সেই অংশে মনে রাখিবে—দ্বিতীয়-বোধ-রহিত এক বুঝের কথাই বলিতেছি। এই উপদেশ বিভিন্ন জ্ঞান সত্ত্বে ধারণা করা কঠিন। ধারণা করিতে গেলেও লোক পাগল হয়। তবে আমাদের ও-সব মারামারি চরম মীমাংসার কথায় কাণ না দিয়া, কেবল বস্তুর বিচার না করিয়া, তাহার কার্য্য নিয়া বিচার করা মন্দ নয়। মাঝে মাঝে এদিক্ ওদিক্ আসিবে; তখন গুরু মঙ্গলময় এই ধারণা দৃঢ় রাখিয়া এদিক্ ওদিক্ বিচার করিলে কোনও অনিষ্ট ঘটে না। যে পর্য্যন্ত পড়া-শুনা, সংসার-অসংসার ইত্যাদি ভেদ্-জ্ঞান থাকে, সেই পর্য্যন্ত 'তাঁর' নাম গান, নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ, 'তাঁর' আদেশ পালন ও 'তাঁর'

নাম-রূপ চিন্তা, ইহাই জীবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তদ্‌ভিন্ন বিভিন্ন জ্ঞান নিয়া, দেহে বিভিন্ন ক্রিয়া সত্ত্বে, 'তাঁহার' জ্ঞানাতীত জ্ঞানের অনুসন্ধান মোহেরই কারণ হইবে। যেহেতু জ্ঞান ক্রিয়ানুরূপ; ক্রিয়াতীত জ্ঞান, ক্রিয়াসত্ত্বে ধারণা করিতে গেলে কিছুই না, সম্পূর্ণ ভ্রান্তি বলিয়া ধারণা হইবে। এই জন্যই প্রত্যেক পত্রে 'গুরু-গুরু-গুরু-গুরু' এই শব্দটি মাত্র না লিখিয়া নানা কথা লিখি।

নানা কথার মানুষকে এক কথায় বুঝাইতে গেলে, সে নানা কথা বলিবে। এক কথায় আনিতে হইলে নানা কথা বলা আবশ্যক। যেহেতু, যে যত কথার মানুষ, তাহাকে তত গুলি কথা বলিয়া—সে সব কথা ভুল তাহা বুঝাইতে হইবে। ২৫ কথার একটি মানুষকে ৫ কথা দিয়া এক কথায় আনিতে গেলে বাকী ২০ কথায় তা'র গোল থাকিবে। ২৫ কথাই ভুল, ইহা বুঝাইয়া শেষে এক কথা বলিলে, সে নিঃসংশয় রূপে এক কথায় আসিবে। নচেৎ ৫ কথা ভুল দেখাইয়া, ২০ কথা বাকী রাখিয়া, এক কথায় আনিতে গেলে, সে এক কথায় আসিবে না। বিশেষ—যে, যে কথাকে দৃঢ়রূপে ঠিক ধারণা করিয়া আছে—তাহাকে সে কথা বিশেষরূপে ভুল বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই হেতুই—পিতা-মাতা-

জ্ঞান আদিতে যে ভুল হইতে উৎপন্ন, সেই ভুল অভাব করিবার জন্য গুরু, মা-বাবা সাজিয়া—মা-বাবাটা ভুল প্রমাণ করিয়া থাকেন। আগে মা-বাবার পরিবর্ত্তে গুরুকে মা-বাবা রূপে না দেখিলে—মা-বাবাটা যে ভুল, তাহা কিছুতেই বুঝিবে না। কেননা, গুরুর মা বাবা-রূপ ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়া যখন তিনি স্বরূপ-রূপে অবস্থান করিবেন, তখন শিষ্য দেখিবে – মা-বাবা বলিয়া যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ও-রূপটা ঠিক নয়। তাই বাবা,—তোমাকে বাবা বলিয়া ডাকি; তুমি যদি এই বাবা শব্দেতে মুগ্ধ হইয়া আমাকে ভালবাস, পরে আমাকে চিনিবে। যে আমার বাবা ডাকে সন্তুষ্ট নয়, পুত্রের বাবা ডাকে মুগ্ধ - সে আমার স্বরূপ কোন দিনই বুঝিবে না। সে পুত্রের রূপই বুঝিবে এবং অন্তিম-কালে সেই পুত্রের রূপই দেখিবে। তা'র জন্য আমি তাহাকে পুত্র রূপেই পুনঃ পুনঃ বাবা ডাকিব; তদ্‌ভিন্ন অন্য ডাকে সে সুখী নয়। অন্য রূপে ডাকিলে সে শুনিবে কেন? যে যাহা ভালবাসে, গুরু তাহাকে সেই রূপেই ভালবাসেন। ভালবাসার তারতম্যে সুখ দুঃখের যে তারতম্য হয়, সেই ফল জীব ভোগ করে; গুরুর কোন ফলই (সুখ-দুঃখ) অর্শেনা।

গুরুর নিজের স্বরূপ 'গুরু'। তিনি গুরু রূপেই

সকলকে দেখা দিতে চান; জীবের প্রকৃতিতে ভাল লাগে না বলিয়া অন্য রূপ হন, জীবও অন্য ফল পায়। তবে আমাদের পিতা-পুত্রের ভালবাসাটা যাহাতে দৃঢ় হয়—এ পাঠ্যাবস্থায় তাহাই যেন ভাল। বেশী উপরের দিকে উঠিলে, প্রাণটা উপরে উঠিয়া গেলে এম্, এ পড়াটা যেন বড় কষ্টকর হইবে। এই অবস্থায় এম্, এ পড়াটা যাহাতে ভাল হয় তাহা করাই কর্ত্তব্য। কারণ এম্, এ পাশ করিয়া দীনবেশে দ্বারে দ্বারে গুরু-গুরু ধ্বনি করিলে অনেকের প্রাণেই একটা চমক্ লাগিবে এবং বিস্মিত হইয়া কিছু কাল শুনিতে ইচ্ছা করিবে এবং কোন কোন হতভাগার কর্ম্ম গুণে টক্ করিয়া হৃদয়ে সংযোগ হইয়া গিয়া, দুর্দ্দশাও ভোগ করিবে। এই যে অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় পার্থিব সুখ, ভোগাবসানে যাহার কিছু মাত্র চিহ্ন থাকে না, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে।

বাবা! এখন যা' করাও তাই করি; ভাল রূপে ফাঁদে আটকাইতে পারিলে আমার যা' করিবার তাহাই করিব। এখন-তক্ সেই টুকু ঠিক পাও নাই, তাই সংসার-জ্ঞানে এমন নির্দ্দয়কে দয়ালু বলিয়া মনে করিতেছে। গুরুর দয়া কে বুঝে? যে এই সংসারকে দুর্ব্বহ ভার মনে করে—এ-সংসার ঘোর আবর্ত্তন ও দুঃখের হেতু

যে জানে—সেই গুরুকে দীন-বন্ধু মনে করে। যে গুরুর অযাচিত দান প্রাণের সহিত অনুভব করে—সেই প্রকৃত ভাবে গুরুকে দয়ালু বলিয়া বুঝিয়াছে। যে এই সংসার বাসনাকে অনন্ত কাল পরিভ্রমণের হেতু ও দুঃখের মূল বলিয়া বুঝিয়াছে—সে-ই গুরুকে এক মাত্র অদ্বিতীয় বন্ধু বলিয়া দীন-বন্ধু, অনাথ-বন্ধু বলিয়া চীৎকার করিতেছে। তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া—গুরু-তত্ত্ব ভাবিতে গিয়া প্রত্যহই দেখি গুরুর কিছুই বুঝি না অমনি লেখনি বিরত হয়।

বঙ্গাব্দ—১৬.৮-১৮] (৪৬) [প-প্র

মা! তোমার চিঠি পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। বাক্য-মনের অগোচর সেই স্বরূপ পদার্থের জ্ঞান কলি যুগের পক্ষে অসম্ভব; যেহেতু—কলিতে কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞান প্রবল ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া জীবের ধারণা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রবলতায় জীবের ইন্দ্রিয় ব্যাপারের অনুকূল কত কিছু বিষয় আবিষ্কার হইয়াছে এবং দিন দিন হইতেছে। তাহার ব্যবহারের, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এই তিন যুগ হইতে কত প্রকার প্রকার ভেদে

উন্নতি হইতেছে। জীব ইন্দ্রিয় সুখের প্রত্যাশায় কত কি করিতেছে; ইহা দ্বারা পরিষ্কারই প্রমাণ হইতেছে যে, জীবের পক্ষে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয় দৃঢ় ও সত্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ই ভুল। সুতরাং আমার শিক্ষা-দীক্ষা এ-যুগের ধর্ম্ম নয়। কেবল পণ্ডশ্রম করিতেছি ও পণ্ডশ্রমের ফলে রাত-দিন যাতনাই ভোগ করিতেছি। সমাজের চক্ষে আমার শিক্ষা-দীক্ষা হতাদর হইতেছে আরও হইবে।

বঙ্গাব্দ—২৪-৮-১৮] (৪৭) [জ

আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয় ও বুঝা-বুঝি সকলই motionবা ক্রিয়ার ফল; আমরা দেখিতে পাই—সর্ব্বদাই সর্ব্ব কার্য্যে ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনেই, আমাদের দেখা-শুনা ও বুঝা-বুঝি রাত-দিনই ভেদ হইতেছে। বৃক্ষ বীজ-রূপে অবস্থান কালে যেরূপ, ক্রিয়া-প্রভাবে প্রকাশ অবস্থায় আবার অন্য রূপ। আমাদের চক্ষের ক্রিয়ার পার্থক্যে অনেক সময়ে একটাকে দুইটা দেখি; রোগ বিশেষে সর্ব্ব বস্তুকেই হলুদ বর্ণের দেখি; এবং ক্রিয়ার পার্থক্যেই বস্তুকে বস্তুর স্বরূপ আকারে না দেখিয়া ঝাপ্‌সা দেখি।

আবার দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হইলে কোন বস্তুই দেখি না বা বিভিন্ন রূপ না দেখিয়া অন্ধকার বা অন্য কোন রকম দেখি। এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে. ক্রিয়ার পার্থক্যে আমাদের দেখা-দেখির পার্থক্য হয়, এই প্রকারে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও বুঝাবুঝির ভেদ হয়। সুতরাং দেহের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ঘটিলে নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন দেখিব, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। দৃশ্যমান জগৎ—যেরূপ দেখিতেছি. সেরূপও একটা স্থির বা স্থায়ী নয়। নিসর্গের যে কোন বিষয় ধরিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, সব পদার্থের মধ্যেই অবস্থা ভেদ দেখা যায়; যথা—বৃক্ষাদির বীজ, অঙ্কুর ও শাখা-পল্লবাদি সহ পরিণত অবস্থা। প্রাণী জগতে জরায়ুস্থ অণ্ডাকার অবস্থা ও হাত-পা-বিশিষ্ট অবস্থা ও বাল্য-যৌবন-প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্য ইত্যাদি অবস্থাভেদে আকারগত ভেদ। এই নিসর্গের ফল,পুষ্প পত্র ইত্যাদি সকলেরই আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত প্রকার ভেদ দেখা যায়। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান নিসর্গের মধ্যে কোন্ অবস্থা স্থির অবস্থা, তাহা এই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধ দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। সুতরাং একটা স্বরূপ অবস্থা,—আমাদের দেহে যে ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে, ঐ ক্রিয়া-দ্বারা অনুভব করা অসম্ভব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের এই জ্ঞান গুলি ক্রিয়াতে হয় এবং ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে বিভিন্ন হয়। এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একটা স্বরূপ অবস্থা বা স্থির অবস্থা বর্ত্তমান না থাকিলে, এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা কিসের উপর হয় বা কাহাতে হয়? সেই অবস্থা—এই ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ভিন্ন, জ্ঞানে অধিকার করিবে না, এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং আমাদের ক্রিয়া পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক।

এ-স্থলে এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, আমাদের ভিতরে যে ক্রিয়া বর্ত্তমান, তাহার বৃদ্ধি করিয়া ঐ স্থির অবস্থা বা স্বরূপ অবস্থার জ্ঞান লাভ হইবে? না, তাহার খর্ব্ব করিয়া ঐ স্থির অবস্থা বা স্বরূপ অবস্থার জ্ঞান লাভ হইবে? এ-স্থলে দেখা যাইতেছে যে, ক্রিয়ার অতি প্রবল অবস্থায় আমাদের কোন জ্ঞানই থাকে না। বিদ্যুতের battery ধরিয়া আমাদের দেহের ক্রিয়া প্রবল হইলে আমরা জ্ঞান শূন্য হইয়া যাই; ভাল মন্দ কোনও জ্ঞানই সম্ভবে না। পক্ষান্তরে—যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, আমরা বুঝিতে গেলে বা বুঝিবার ইচ্ছা করিলে, আমরা স্থির বা তুষ্টিভাবই অবলম্বন করি; এতদ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, আমাদের বুঝিবার বিষয় বুঝিতে হইলেই প্রাণ স্থির হইতে চায়। গত্যাত্মক অবস্থা গতি-মূলে বুঝা

গেলেও স্থির অবস্থা স্থির না হইলে বুঝা যায় না। মোটের উপর—ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ভিন্ন, বাক্য-ভাষায় বর্ত্তমান ক্রিয়া-মূলক জ্ঞান নিয়া বুঝিতে গেলে, আমার বর্ত্তমান বুঝ অনুসারেই 'তাঁহাকে' বুঝিব। এই হেতুই সম্প্রদায় বিশেষ—অথবা ব্যক্তিভেদে ভগবানের অনন্ত-ভেদ হইয়াছে ও হইবে; ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। যখনই সাধারণের রুচি পরিবর্ত্তন হয়, তখনই সাধনেরও ভেদ হয়। এইহেতু—আদিম অবস্থায় উপনিষদের প্রণালী অনুসারে 'একমেবাদ্বিতীয়ং'এর সাধন ছিল, এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের অতীত বলিয়া বাক্য-মনের অগোচর 'সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ' 'তাঁহার' উপাধি ছিল। পরে প্রকৃতির ক্রিয়া সহ মানব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে—পুরাণের সময়ে পৌরাণিক সাধন ও শেষে বিশেষ পরিবর্ত্তনে—তান্ত্রিক সাধন ও বহু উপধর্ম্মের ও দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে আবার প্রকৃতির প্রাবল্য-হেতু—সাধন-ভজনের স্পৃহা কমিয়া গিয়া কেবল মাত্র পার্থিব সুখ-দুঃখের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া উদর পূরণ ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায়। ইহা একটা বাক্য-ভাষার ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্ম, আমরা আমাদের

ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে বিভিন্ন রকমে বুঝি ও বিভিন্ন রকম বলিয়া ধারণা করি। অতএব ইন্দ্রিয়ের বুঝা-বুঝি রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত নির্দ্বন্দু ধর্ম্ম লাভ জীবের পক্ষে অসম্ভব।

বঙ্গাব্দ—৪-৯-১৮] (৪৮) [জ

অদ্য তোমার চিঠি পাইলাম। চিঠিখানা পড়িয়া কিছু যাতনাও বোধ করিলাম। মনে আসিল জগতে সমস্তই ব্রহ্ম-জ্ঞান বিরুদ্ধ, অনুকূলে কিছুই নাই; শেষে ধর্ম্মও সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিরুদ্ধ দেখিয়া প্রাণ শুষ্ক হইতে লাগিল—ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আসিল। ভাবিয়া দেখিলাম,—ধর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্ম কোথায়? অর্থাৎ ভারতের সমস্তই উপধর্ম্ম; উপাস্য উপাসক কে, এ জ্ঞান নাই—শুধু কেহ এক জন আছে—তাঁহার উপাসনা আছে, এ-জ্ঞানে জীব যখন উপাস্য-উপাসক-ভাবে উপাসনা করে, তখন কি উপাসনা হয়—ইহা ভাবিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। ডাকে কে—কারে ডাকে জানি না-এ ডাকা-ডাকিতে কি শুভ ফল সম্ভব? সংসারেও কেহ কাহাকে ডাকিলে কে ডাকে, কা'রে ডাকে, তাহা না জানিলে অমনই ডাকের বিরতি হয়; শ্রোতাও অন্য মনস্ক হইয়া মনের

অভীপ্সিত ব্যাপারে নিযুক্ত হয়। মন যাহা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সংস্কার বলে স্থির বলিয়া বুঝিয়াছে, সেই স্থির সিদ্ধান্তই স্থির ভাবে থাকিতে পারে; অজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে মনের স্থির থাকিবার শক্তি নাই। যেহেতু মনের লক্ষ্য ভিন্ন স্থির থাকা অসম্ভব, লক্ষ্য না থাকিলে মনেরই অস্তিত্ব লোপ পায়। যখন দেখা যায়—লক্ষ্য অভাব হইলেই মনের অভাব হয়, তখন মন কিছুতেই লক্ষ্য পরিত্যাগ করিতে চায় না।

বহু কাল যে কোনও ব্যবহারই করা যায়, তৎ-ব্যবহারের বা ধারণার বিপরীত ব্যাপার শোনা মাত্রই মানুষের অসম্ভব বোধ হয়। এমত স্থলে—তাহাকে বিপরীত ব্যবহারে আনিতে হইলে, বিপরীত ব্যবহারের আনুষঙ্গিক ব্যাপার সকল দীর্ঘ কাল দেখা শুনা আবশ্যক। অথবা তাহার ব্যবহার নিজে যখন ভুল বুঝে, তখন তাহাকে বুঝাইলে বুঝে। এমন কি, সংসারে ঠিক ব্যাপারকেও যদি কার্য্য-কারণে বেঠিক বুঝে, তখন ঐ বেঠিক অনুরূপ বেঠিকের অনুকূলে যে সব কথা তাহাও ঠিক বুঝে। তুমি যে কারণে, যে হেতুতে—গুরু-বাদ ঠিক বুঝিতেছ, সে কারণ যেখানে অভাব, সেখানে গুরু-বাদ বলিলে বা বুঝাইতে গেলে উপহাসাস্পদ হইবে। ধর্ম্মের জন্য বা ব্রহ্ম-জ্ঞানের জন্য নির্জ্জনতা আবশ্যক—ইহা,

যাহারা জন-সমাজে থাকিয়া আনন্দ পায়, তাহাদের কাছে বলিলে পাগল মনে করিবে। আহার-বিহার, আমোদ-প্রমোদ আবশ্যক বোধ হইলে—নির্জ্জনতা অতি তীব্র-ভাবে প্রাণকে জ্বালা দেয়। আবার এই পার্থিব সুখ-দুঃখে বিরক্তি আসিলে—পার্থিব সুখ-দুঃখ নিয়া নাচানাচি করিতে বিরক্তি আসিবে।

সঙ্গ একটা ভীষণ জিনিস; সঙ্গ মানুষকে সমস্ত শিক্ষা দেয়। ইউরোপীয় ছেলে-পিলে বাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াই mother, father বলিয়া থাকে ও সাংসারীক যাবতীয় ব্যাপার ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষা লাভ করে। আবার বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালা ভাষা বলে, বাঙ্গালীর অনুরূপ ব্যবহার শিখে। একি সঙ্গের গুণ নয়? সুতরাং সঙ্গ দ্বারা মানুষের সব ব্যবহার সম্ভবপর। বিরুদ্ধ সঙ্গে থাকিয়া তোমার ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়ায় থাকা অসম্ভব হইবে। বিশেষ—স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে বিরুদ্ধ ব্যবহার বিষের মত বিষময় ফল উৎপন্ন করে। যেরূপ বিষ্ঠা-কূপে পতিত হইলে সমস্ত শরীর কলুষিত হয় অর্থাৎ দুর্গন্ধময় হয়; কিম্বা বিষ্ঠা-কূপের নিকট গেলেও বায় সংযোগে দুর্গন্ধ আসিয়া নাসিকা বিবরে প্রবেশ করিয়া দুর্গন্ধ অনুভব করায়, সেই-রূপ যে বিষয় ব্যাপারে—পার্থিব যে কোন ব্যাপারের

মধ্যে-- থাকা যায়, সেই ব্যাপারের কোন না কোন অবস্থা আমাদের মনের মধ্যে প্রত্যক্ষ কি অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রবেশ করেই করে এবং তন্মুলক ক্রিয়া-বৈষম্য দ্বারা ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ঘটায়; অর্থাৎ মানুষের মানসিক অবস্থা যেরূপ থাকে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সেই অবস্থার অবস্থান্তর করিবেই করিবে। তবে যে অবস্থায় পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নয় সেই অবস্থায় সব সম্ভব। কোন মায়া-মোহ-বর্জ্জিত মানুষ. মনুষ্য-পরিপূর্ণ স্থানে থাকিলেও তাহার কিছু আসে যায় না। এ জগৎ-বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য অন্ধের নিকট কোন ভাল-মন্দ ফল প্রদান করে না। তুমি তোমার প্রাণের বেদনা বলিবার লোক পাও না; কারণ তোমার প্রাণের মত প্রাণ পাও না বলিয়াই বলিতে পার না। পক্ষান্তরে—তোমার প্রাণের বিপরীত ভাবাপন্ন প্রাণও তোমার সহিতসংযোগ হইতে চায় না। এ-স্থলে উভয়েরই বিড়ম্বনা এবং এই উভয়ের বিপরীত ভাব মিশিয়া তৃতীয় আর একটা অবস্থা জন্মে। জগৎ-বৈচিত্রও এই রকম বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণে—বিভিন্ন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের বিষয় হইয়াছে। মোটের উপর—মানব দেহের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনেই জ্ঞানের ও ধারণার পরিবর্ত্তন হয়। এক রূপ ক্রিয়ায় অপর অবস্থা ধারণা করিতে গেলেই ভুল ধারণা

হইবে ; সুতরাং তোমার ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়া যাহার দেহে নাই, তাহাকে বুঝাইতে না যাওয়াই ভাল।

* * যেখানেই ভাল বিষয় পাও গ্রহণ করা উচিত। সৎসঙ্গ সর্ব্বদাই গ্রহণীয়।

বঙ্গাব্দ—১১-৯-১৮] (৪৯) [জ

তোমার চিঠি পাইলাম। বাক্য-ভাষা, কথা-বার্ত্তা, বুঝা-বুঝি সকলই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ব্যাপার ; অতীন্দ্রিয় বিষয় পক্ষে এ সমস্তই ভ্রান্তি। তবে সেই ভ্রান্তি বুঝাইবার জন্য ঋষিরা ভ্রান্তি দ্বারাই ভ্রান্তির নিরাকরণ করিয়াছেন। ভ্রম ভ্রম-জ্ঞানেতেই ভ্রম বলিয়া বুঝে ; ঠিক্ জ্ঞানে ভ্রমের অস্তিত্বই থাকে না, সুতরাং ভ্রম বুঝিবে কে? তদবস্থায় ঠিক্ বিষয় কিছু বলিবারও নাই। তবে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার সংসারে এই যে—আমাদের ক্রিয়া বা vibration অনুরূপ জ্ঞানে তৎক্রিয়ার বা vibration এর বিপরীত বিষয় যে বুঝি বলিয়া বোধ হয়, উহা যেমন দ্রুতগামী শকটারোহণে স্থির পদার্থকে চক্ষে গতি-বিশিষ্টই দেখে, অথচ মনে করি যে উহা স্থির। কিন্তু স্থির অবস্থায় স্থির দেখিলে যেরূপ স্থির বুঝি, ঐ মনে করার স্থির

অবস্থাটা সেরূপ বুঝি না। এই দৃশ্যমান জগৎকেও ভাষায় পরিবর্ত্তনশীল বলি, কিন্তু পরিবর্ত্তন প্রাণের সঙ্গে বুঝি কই? আমাদের নিজের দেহ যাহাকে ভ্রমে 'আমি' বলিয়া ধারণা করি,তাহা যে ক্রমে motion মূলে বাল্য কাল হইতে এ-পর্য্যন্ত এত পরিবর্ত্তন হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে,—সেই পরিবর্ত্তন আমাদের জ্ঞানে কিছু মাত্র অধিকার করে নাই। কেবল চিন্তা করিলে এই মাত্র বুঝি যে, সেই বালক-কাল আর এই বর্ত্তমান অবস্থা উভয়ের মধ্যে এত তফাৎ। কিন্তু ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়া যে এত দূর হইয়াছে, সে পরিবর্ত্তন কিছুই অনুভব করি নাই। সেইরূপ মানুষেরও সংসর্গ-মূলে ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়া বিশেষ কোনও এক অবস্থায় গেলে, সেই অবস্থার সঙ্গে তুলনায় পূর্ব্বের অবস্থার কি পার্থক্য হইয়াছে, তাহাই মাত্র অনুমান করিতে পারা যায়; কিন্তু মাঝে যে ক্রমে পরিবর্ত্তন হয় তার কিছু মাত্র অনুমান হয় না। আবার ঐ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যে অবস্থা ঘটে, অভ্যাসের দরুন সেই অবস্থায় আর পরিবর্ত্তন করিতে শক্তি থাকে না। বিশেষ—ক্রিয়ার বিপরীত ব্যবহার উচিত মনে করিলেও, করিতে অক্ষম হয়। এজন্য ঋষিরা প্রত্যেক শাস্ত্রে সঙ্গকে ভয়াবহ জিনিস মনে করিয়াছেন। গতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, গতি সংযোগে গতির বৃদ্ধিই হয়;

কিন্তু গত্যাত্মক পদার্থ তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারে না। সর্ব্বদাই আমরা দেখিতেছি যে, যে ব্যাপার আমার রুচি-বিরুদ্ধ,সঙ্গ-মূলে ক্রমশঃ আবার সেই ব্যাপারই রুচিকর হয়। আমি তোমার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিতেছি, পূর্ব্বেও চিন্তা করিয়াছিলাম যে, সমাজ-সঙ্গ তোমার পক্ষে ভীষণ অন্তরায় হইবে; তবে একটা কথা মনে ছিল— সময় সময় তোমার সঙ্গে সংসর্গ হইলে ঐ অভাবটা কাটিয়া যাইবে। সঙ্গ হওয়ার বাধা হওয়াতে আমিও একটু হতাশ হইয়াছি। প্রথমেই মাকে তোমার সঙ্গী করা উচিত ছিল; আমি প্রথম সময়েই এ-কথা তোমাকে অনেক বার বলিয়াছিলাম। গোড়ায় তুমি এটা গুরুতর ভুল করিয়াছ। তোমার বিচার ও মীমাংসা অনুসারে তুমি ভুল মনে না করিতে পার, কিন্তু পরে দেখিবে সকলের চেয়ে এটাই তোমার ভীষণ অন্তরায় হইবে।

x'masএর বন্ধে ৮।১০ দিন ক্রমান্বয়ে যোগ-সূত্র চর্চ্চা হইয়াছে। প্রমোদ আসিয়া ৪ দিন ছিল। অত বড় বিস্তৃত ব্যাপার তোমাকে লিখিয়া ব্যক্ত করা কাহারও শক্তিতে কুলায় না। তবে প্রসঙ্গগুলির মধ্যে—'মোহ কি, মোহ বিনাশের উপায়ই বা কি?' 'সাধন কেন?', 'সাম্প্রদায়িকতা কিসের থেকে আসিল', 'সৃষ্টি-বৈচিত্রের মূলে কি শক্তি', 'মানুষের স্বতই রুচি কিসে' ইত্যাদি

অনেক বিষয়ই হইয়াছে। বিশেষ,—'গুরু-বীজ ও গুরু-বীজের আবশ্যকতা' শিষ্যদিগকে বিশেষরূপে বুঝান হইয়াছে। এই সব বিষয়ে গৌতম, জাবালি ও মার্কণ্ডেয় ঋষির মীমাংসা বলা হইয়াছে।

বঙ্গাব্দ—৩-১০-১৮ (৫০) [সু

সর্ব্বদাই চিঠিতে উপদেশ চাও। আমি নিজে রোগা উপদেশ কি দিব? রোগার রোগ-ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে ভুল। কারণ, রুগ্ন অবস্থায় লোক প্রকৃতিস্থ থাকে না; সেই অবস্থায় অন্যের প্রকৃতি নিরুপণ করা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা অনেক সময়ে নিজে যে বিকার-গ্রস্ত, তাহা ভুলিয়া গিয়া অপরের বিকার দেখি। তখন নিজের বিকার একেবারেই বিস্মৃত হই এবং নিজকে প্রকৃতিস্থ বুঝি। অনেক সময়ই আত্ম-বিস্মৃতি আসিয়া - অথবা পরের প্রতি লক্ষ্য আসিয়া আপনাকে ভুলিয়া গিয়া - একে আর ভাবি। যখন অন্য কাহাকেও বন্ধু ভাবি, তখন আপনিই যে আপনার বন্ধু নয়, এ-কথা ভাবিতে আর সময় থাকে না। যখন পরের দোষ দেখি, তখন নিজে যে শত দোষে দোষী তাহা বুঝিতে পারি কই? যখন অন্যে বৃথা সময়

নষ্ট করিতেছে চিন্তা করি, তখন নিজের মূল্যবান সময় যে অনবরত স্রোতের মত অবিরাম গতিতে চলিয়া যাইতেছে, তাহা ভাবি কই? জগতে প্রতিনিয়তই লোক চলিয়া যাইতেছে—আসিতেছে আমি প্রতি দিন দেখি; আমি নিজে যে চলিয়া যাইব, তাহা ভাবিতে সময় পাই কই? সব ব্যাপারেই পরকে বাদ দিয়া নিজকে নিয়া নিজের বিচার করিয়া, নিজের অবস্থা ঠিক করিয়া পরকে দেখা আবশ্যক মনে করিলে—দেখা উচিত। প্রথমেই অপরকে দেখিতে গেলে, আপনাকে আদৌ ভুল করিতে হয়। এ-পর্য্যন্ত পরকে নিয়া যত ব্যাপার করিলাম, * * মনে চিন্তা করিয়া দেখিলাম সর্ব্বৈব ভুল করিয়াছি। যাহাদের বিশেষ আত্মীয়-বন্ধু মনে করিয়াছি, তাহারা সকলেই নিজ নিজ সুখ-দুঃখের জন্য আত্মীয়-বন্ধু; নিজেও অপরের আত্মীয়, কি নিজের সুখের বা দুঃখের জন্য, তাহা তালাস করিতে করিতে রাত্রি অবসান হইল। * *

বঙ্গাব্দ—৪.১০-১৮] (৫৯) [সু

কি লিখিব বাবা, ভাবিয়া পাই না। যে ভাবের মূলে দুনিয়াদারী-কথা-বার্ত্তা, লেখা-লেখি, সে ভাবেরও ভাব পাই না। এই ত এক সপ্তাহ কালও অতীত হয় নাই জল-বসন্ত-উপাধি-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কি ভাবিয়াছি, কি বুঝিয়াছি, কি করিয়াছি,—বর্ত্তমান ভাবের ভাব ধারণাও করিতে পারি নাই; কি ভাবে ছিলাম আজ আবার সে ভাবও ধারণা করিতে পারি না। তোমার আসক্তি কি ভাবে ছিল, আজ আবার তুমি চিঠি না পাইয়া কি ভাবে আছ, ভাবিয়া এ কোনও ভাবেরই ভাব পাই না। ভাবের মূলে কে, কেন ভাবি, কা'রে ভাবি, এ ভাবের পরিবর্ত্তনই বা করায় কে? শুইয়া শুইয়া এইরূপ ভাবি,—আবার বসিয়া, হাটিয়া, চলিয়া ভাবিলে আর এক রকম ভাবি। * * ভাবের মূলে কি এবং কে? কেন ভাবি? কা'র জন্য ভাবি? ভাবিতে গেলে কিছুই পাই না। প্রাণ কাঁদে ভাবের মূলে কে? যখনই সমুদ্রের তরঙ্গের মত প্রাণে মুহুর্মুহু ভাব-তরঙ্গ হিমালয়ের শিরোদেশ স্পর্শ করে—তখনও খুঁজি ভাব কি এবং ভাবের মূলে কে?

জগতের অন্য পদার্থের সহিত মিলিয়া অনন্ত ভাবের

উদ্রেক হয়। যখন যে ভাব হয় তখন সেই ভাবই যুক্তি-তর্কে ঠিক বুঝি। আবার ভাবান্তর আসিয়া সেই ঠিক বুঝই বেঠিক হইয়া অন্য ভাব ঠিক হয়। চিন্তা করিয়া অমনি প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে,—ভাব কি এবং ভাবের মূলে কে? শৈশবে মাতৃ-ক্রোড় অনন্ত সুখের আধার, সমস্ত জগতের একমাত্র লীলাস্থল; আবার যৌবনে স্ত্রী একমাত্র উপাস্য দেবতা—ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পুত্র-কন্যা, ঘর-দরজা, বাগান-বাড়ী – কত ভাবেরই কত তরঙ্গ ঠিক-বেঠিক ভাবে মনে বিরাজ করে। আবার ধ্রুবই যাইতে হইবে, ইহার কিছুই থাকিবে না, ইহা যখন সিদ্ধান্ত হয় তখন কোন ভাবই আর প্রাণে স্থান পায় না; কি যেন এক অভিনব ভাব প্রাণে উদয় হয়—তখন প্রাণে প্রশ্ন ওঠে,– কেন, কি ভাবে এ-জগতে এত কাল কি ভাবিলাম, কে ভাবিল?

যখন যে ভাবে গলি—সেই ভাবেই তখন চলি এবং ঠিক বুঝি; আবার ভাবান্তরে বেঠিক বুঝি। ভাব ঠিক কি বেঠিক? উহা কে বুঝাইবে, কে বুঝিবে? কেবল এ-ভাব নিয়াই ভাবের বিচার করিতে করিতে দিনাতিপাত করিয়া অন্তিমে কি ভাবা উচিত, কি ভাবিব, ইহা ভাবিবার সময় থাকে না এবং অভ্যাস বশতঃ পূর্ব্ব ভাবের অভাব করিয়া নূতন ভাবের ধারণাও করিতে পারে না। তখন আর কে ভাবিবে, কি ভাবিব?

ভাবের কি অপার মহিমা! পুনঃ পুনঃই ভাবিয়া দেখিতেছি—যাহা এক সময়ে ঠিক বুঝি, তাহাই আবার দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থাভেদে ভুল বুঝি। তবু ভাব ঠিক বই বেঠিক বুঝি কই?

বিশ্বপাতার বিশ্ব-গ্রন্থে ভাব একটা ভ্রান্তি মাত্র; প্রতিনিয়ত জগতের পরিবর্ত্তন দ্বারা ইহা 'তিনি' বুঝাইয়া দিতেছেন - আমি বুঝি কই? আমি যখন যে ভাবে উন্মত্ত, তখন সেই বিশ্ব-গ্রন্থের পরিবর্ত্তনই বা চক্ষে দেখি কই? তবে, ভাব বেঠিক কি ঠিক কে বুঝাবে? কি বুঝিব? বুঝাইবার জন্য ভাব নিজেই ভাবকে বেঠিক বুঝাইতেছে। এই ত রুগ্ন শয্যায় ইহার সকল ভাবই ভুল বুঝিয়াছিলাম, এখন বুঝি কই? তবে ভাব কি? এবং কে বুঝাইবে? এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ প্রাণে আসিয়া আমার হৃদয়ে হৃদয়-নাথ যেখানে বিরাজ করেন– সেই দিকে দৃষ্টি করা মাত্র দেখি যে, ভাব সর্ব্বৈব ভুল। এক অপূর্ব্ব ভোজবাজীর বাজী ঠিক বুঝিয়া তাহাতেই বাধিয়া আছি। কা'রে শুধাই? তালাস করিয়া দেখিলাম—ঋষিদের প্রদর্শিত 'গুরুই' এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির এক মাত্র সত্য ও প্রকৃষ্ট উপায়। যখনই 'গুরু-গুরু' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম—তখন এ-জগতের কোন ভাবই আর প্রাণকে অধিকার করিল না।

ভাবই মাত্র ভাবের আত্মা, প্রাণ, অস্তিত্ব; মূলে কিছু নাই। দেখিলাম,—‘গুরু’হইতে বিযুক্ত হইয়াই নানা স্থানে নানা ভাবকে ঠিক বুঝিয়াছিলাম। এখন আর সে নানা ভাব নাই, ঠিকও এক প্রকার বই নানা প্রকার নাই। তবে ‘গুরু’ হইতে বিযুক্ত হইলেই ‘আমার ও আমি’ এই উভয় ভ্রান্তি আসিয়া ভাব কি ও ভাবের মূলে কে, এই অবস্থা জন্মায়। ভাব কি, বলিলে—তদুত্তরে বলিতে হয় ‘আমি’; ভাবের মূলে কে বলিলেও—তদুত্তরে ‘আমি’। ‘আমি’ যত সময় আছি, অথবা ‘আমি’ যতক্ষণ ‘গুরুতে’ না থাকি, ততক্ষণ আমার জন্য পর্য্যায়ক্রমে জগতের সর্ব্ব ভাবই ঠিক ও বেঠিক।

এইমাত্র এবার জল-বসন্ত রোগে ভুগিলাম। রোগের হেতুও আমি ও আমার। এখনও রোগের ভাবে কতক ভাবান্তর আছে,তাই ভাবের নূতনত্ব; এই ভাবের কথাতেই একটু অনুধ্যান করিলে বুঝিবে। শরীর দুর্ব্বল, আর দোতালা সেরূপ সুন্দর দেখি না, তেমন আগ্রহের জিনিস নয়। যা'র জন্য পূর্ব্বে ব্যস্ত ও অস্থির হইয়া ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষ কত ভাবের উদ্রেক হইয়া—কত ভাবে আমাকে কত ব্যবহার করাইয়াছে—আজ সে সব কথা স্মৃতিতে আসিলে লজ্জা বোধ হয়। পূর্ব্বে সেই ভাবই ধ্রুব সত্য ধারণা ছিল এবং ঠিক করিয়াছি বলিয়া বিন্দু মাত্রও

অনুতাপ ভোগ করি নাই। তবে দেখিলাম— বুঝি অথচ পারি না। ইহার মূলে, জন্ম-জন্মান্তর হইতে আমাতে আমার অনুরূপ ক্রিয়া প্রোথিত; এ-জন্মেও আমার মত আমি ভাবিতেছি, বুঝিতেছি, সুতরাং 'আমার'-জ্ঞানই ভাবের কারণ। 'আমার'-জ্ঞান থাকিতে ভাব বুঝা ও ভাবের অভাব করা—এক ভাব ছাড়িয়া আর এক ভাব মাত্র।

বাস্তবিক ভাবের অভাবে 'আমি'র অবস্থা তা' নয়, অর্থাৎ প্রকৃত 'গুরু' বুঝিয়া ভাবাতীত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ আমার ভাবানুরূপ 'গুরু' বুঝিলেও আমার ভাব আমাতে বর্ত্তমান থাকিবে। বাস্তবিক পক্ষে ভাব বলিয়া একটা জিনিস নাই। 'আমি' ভাবের কারণ। আমির সূক্ষ্মত্ব ও গুরু-বুঝার তারতম্যে ভাব সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবে বর্ত্তমান থাকে। 'গুরুকে' যে পরিমাণে বুঝিয়া আমার আমিত্বের সূক্ষ্মত্ব হইবে—আমার ভাবও সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম হইবে। আর কোনও উপায় নাই ভাবিয়া এই বুঝিলাম,—ভাবের অভাবের অন্য ঔষধ নাই, এবং ভাব, অভাব না হইলেও, ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া স্থানে স্থানে স্রোতে নিপতিত বৃক্ষাদির ন্যায়, টেকে বেঁকে ঘুরিতে হইবে। যেখানে জোয়ার-ভাটা কিছু নাই, সেখানে না গেলে স্থির থাকা যাইবে না।

স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া স্থির হওয়ার চেষ্টা যেমন

নিষ্ফল; ভাবের দ্বারা ভাবের বিচার করিয়া ভাবাভাবের অতীত হওয়াও সেইরূপ নিষ্ফল। তবে, সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষে এই 'আমি'র পরপারে যাওয়ার নানা পথ কল্পনা করিয়াছে; তাহাও 'আমি'র ভাব তরঙ্গে ভাবের ফল মাত্র। আমি সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত সেই 'গুরু'-চিন্তা-ধ্যান ভিন্ন অন্য উপায় ঠিক বলিয়া বুঝি না। কেন না, 'গুরু' ভাবিয়া আর 'আমি' এবং 'আমার' ভাব কিছুই থাকে না। যদিও এ-কথা সতঃসিদ্ধ সত্য, তথাপি জীবের পক্ষে 'আমি'টাকে বাদ দেওয়া শক্ত, তাই বলিয়া যাহাতে 'আমি-তুমি' উভয়ই থাকে - জীব সেইরূপ পথই অনুসরণ করিতে চায়—ইহা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। এই জন্যই এই সাধনাটা সর্ব্বজনীন কোন কালে ছিল না—হইবেও না। 'আমি-তুমি' নিয়া নাচা নাচি, ভাব স্রোতে অনন্ত-ভাবের উৎপত্তি হইয়া অনেক সময়ে, 'তুমি' বাদ দিয়া 'আমির' ভাবেই ভাবিয়া যাই। তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন --"চিনি হইতে চাই না মন, চিনি খাইতে চাই"। অনেক স্থলে অনেক সাধকের অনেক কথা দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, 'আমি আমার' নিজত্বটা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

চিঠি-পত্র একটু বিস্তারিত করিয়া না লিখিলে বা গাট্টি-বোচ্‌কা তোল, এই জন্য এই চিঠিখানা লিখিলাম।

বঙ্গাব্দ—৫-১০-১৮] (৫২) [জ

আমরা সর্ব্বদাই অভীষ্ট-দেবতার উপাসনা করি; বিশেষ-যখন যে দেবতার হাত হইতে কিছুতেই এড়াইবার সাধ্য নাই, তখন তাহার উপাসনাই আমাদের জীবনের ব্রত হয়। আমিও এই কয় দিন জল-বসন্তের উপাসনায় জগতের অন্য উপাসনা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই উপাসনা দ্বারা এই বুঝিলাম যে, আমার প্রকৃতি অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রকৃতি অনুরূপ উপাসনা বাদ দিয়া, প্রকৃতির অতীত উপাসনায় স্থির থাকা আমার আমিত্ব বর্ত্তমানে অসম্ভব। আজ যা' বুঝিতেছি, এই কয় দিন ইহার কিছুই মনে আসে নাই, কিছুই ভাবি নাই, আজও পূর্ব্ব ভাবানুরূপ কোন ভাব নাই। তবে ভাব নিয়া এত মারামারি করি কেন? এই মাত্র বুঝি—ক্রিয়ায় যখন যে ভাব জন্মায়, সেই ভাবই ঠিক বুঝি; ইহা ত চির কালই বুঝিয়া আসিলাম ও বুঝিব। বাল্যে মা বুঝিয়া ছিলাম, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে কত ভাবই ভাবিলাম, কত বুঝই বুঝিলাম—সে সব ভাব বর্ত্তমানে কিছুই নাই। তবুও ভাবের একটা বাহাদুরী নিয়া গভীর-ভাব বিশিষ্ট হইয়া ভাবের গবেষণা

কতই করি। ভাবাতীত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ভুল ঘুচিবে না—যেহেতু ভাব নিয়া ভাবিতে গেলে কোন ভাবই স্থির বা নিশ্চয় থাকে না। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ভাবের বৃদ্ধি-বই অভাব হইল না, স্থির ভাব কিছুই পাইলাম না—কত ভাবিলাম, কত করিলাম, করার শেষ হইল না। কি করিতে আসিলাম—তাহা ভাবিলাম না।

এবার জল-বসন্তে আক্রান্ত হইয়া, চৈতন্যের "জীবে দয়া - নামে রুচি" চিন্তা করিলাম, তাহাও দেখি ভাবের খোঁচাখুঁচি। ভাবের মূলে কি, ভাবই বা কি, ভাবিয়া এই বুঝিলাম—যত সময় আমার আমিত্ব আছে, ততকালই আমার ভাবাভাব, লাভালাভ, জয়াজয় সকল আছে; যেহেতু 'আমিও' ক্রিয়া-মূলক। ক্রিয়া-রহিত 'আমি'তে ভাবাভাব, লাভালাভ কিছুই সম্ভবপর নয়। তবে ক্রিয়া-বিশিষ্ট আমি, ক্রিয়া-মূলক-চিন্তা নিয়া 'আমি'কে বাদ দিতে কিছুতেই রাজী নয়; এই হেতুই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"চিনি হইতে চাই না মা, চিনি খাইতে ভালবাসি"। অনেক সাধকের উক্তিতেই দেখা যায়—'ক্রিয়া-মূলক আমি' বাদ দিয়া একটা সাধন সম্ভবপর, ইহা ধারণার বিষয় নয়; ক্রিয়া-মূলক-জ্ঞান নিয়া ধারণা হওয়াও অসম্ভব। এই জন্যই জগৎ ভরিয়া আমি-তুমি নিয়া

সাধন। আর্য্য ঋষিরা সেই 'আমি-তুমি'র মধ্যে 'গুরু ও আমি' এই দুই নিয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছেন; কেননা 'গুরু' এই শব্দের দ্বারা যে 'তুমি'কে বুঝায়,—সেই 'তুমি', দ্বিদলে নিয়া যায়, অর্থাৎ ক্রিয়ার অতি সূক্ষ্মাবস্থায় উপনীত করায়। গুরু-শব্দই দ্বিদলে গতি করায়—অন্য 'তুমি', যা কিছুই বলা যাউক না কেন, ক্রমে পর্য্যায়ক্রমে নীচতর স্থান অধিকার করায়। হরি, কালী, অপরাপর শব্দ গুলি উচ্চারণ করিলেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে—অন্য 'তুমি'তে অত উপরে উঠে না। জীবের ক্রিয়া বর্ত্তমানে 'তুমি' না ধরিয়া সাধন সম্ভবপর নয়। তবে আমাদের প্রকৃতি অনুসারে নিকটবর্ত্তী জিনিসকে ধরিতেই সক্ষম ও সম্মত—তদনুসারেই ধরিয়া থাকি। আবার স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রকৃতির কার্য্য বিকাশ পাইয়া—ভাবের স্রোতে ভাসাইয়া নিয়া—নদী-স্রোতে পতিত কাষ্ঠের ন্যায় 'টেকে-বাঁকে' ঘুরিয়া বেড়ায়।

আমি অনেক চিন্তার পর দেখিয়াছি—যেখানে আত্ম-পরিমাণ ঠিক্ না করিয়া অপরের পরিমাপ করি, সেইখানেই ভুল করি। নিজের পরিমাণ ঠিক্ ধারণা করিয়া যখন যাহা করি, তাহাতে আর ভুল সম্ভব হয় না। আমরা কাম, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদির বশবর্ত্তী হইয়া কত সময় কত ব্যভিচার করি; তাহার মূলে আত্ম-

পরিমাণ বিস্মৃতি। নিজের ওজন বুঝিয়া, নিজের ওজন সর্ব্বদা স্মৃতিতে রাখিয়া, যে কাযেই অগ্রসর হও তাহাতে আর ভুল হইবে না। কিন্তু তোমাকে এই যে উপদেশ দিলাম, যখন ভাবের-স্রোতে ভাসাইয়া নেয়, তখন আর নিজের পরিমাপ করিবারও শক্তি থাকে না; অমনি ভুলে পড়ি।

বঙ্গাব্দ—৯-১০-১৮] (৫৩) [স্থ

যাহার যেরূপ ব্যবহার—শাস্ত্রে ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তদ্বিপরীত ব্যবহারই যাতনার কারণ। 'সন্ন্যাসীর দোতালা ঘর'—এ-কথাটা শোনা মাত্রই মানুষের কাণে বিপরীত শুনায়—কাযেই এত লাঞ্ছনা হইতেছে। গৃহীরও সন্ন্যাসোচিত ব্যবহার ভণ্ডামী ও মানুষে বিপরীত দেখে। সেই প্রকার, ঘোর তম-গুণাচ্ছন্ন ব্যক্তির মুখে গুরু শব্দটা যেমন শ্রুতিকটু ও কর্কশ শুনায়—ভগবদ্‌ভক্তের মুখে বিষয়ালাপও তেমনি ভাব ও রস-পরিশূন্য ঠাট্টা-ব্যঞ্জক বাক্যের মত শুনায়। বর্ত্তমান যুগে গুরুটা এজন্যই সর্ব্ব সাধারণ সমক্ষে উপহাসাস্পদ। কেহ 'গুরু-গুরু' করিলে লোকে উপহাস করে ও শ্রবণেও উপহাসাস্পদ

শুনে। এই জন্যই যুগ-চতুষ্টয়-ভেদে ধর্ম্ম-ভেদ হইয়াছে। যেরূপ শব্দ, যাহার মুখে, যেরূপ ভাবে বাহির হয়, মানুষ তদনুরূপই শুনে ও বুঝে। বৃদ্ধের মুখে বালকের ন্যায় আধ-আধ অস্পষ্ট-ধ্বনি শুনিলে লোকে যেরূপ হাসিয়া উঠে—বালকের মুখে বৃদ্ধোচিত বাক্যাদি শুনিলে লোকে যেরূপ ক্রোধ প্রকাশ করে—সেইরূপ বর্ত্তমান জীবের মুখে 'গুরু—গুরু' ধ্বনি শুনিলে লোকের আনন্দ বর্দ্ধন না হইয়া কষ্টই বর্দ্ধিত হয়। তবে শব্দ বিশেষে, অবস্থা বিশেষের সাময়িক অভাব করে এইমাত্র। এই সব চিন্তা করিয়া মনে হয় এ কি করিতেছি, কেন করি, ইহার চরম ফল কি হইবে?

যত দিন প্রকৃতি বর্ত্তমান, তত দিন ব্যক্তিগত অবস্থা সংসারে বর্ত্তমান থাকিবে; কেননা, প্রকৃতি বর্ত্তমানে প্রকৃতির কোন শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব। প্রকৃতির অন্তরালে যে সত্য, যাহার আশ্রয়ে প্রকৃতি অবস্থান করে, তাহার বিকাশ কোন না কোন ব্যক্তিতে হইবেই হইবে; সেই প্রকার দেশ-কালেরও এক দেশে অভাব হইয়া অন্য দেশে বিকাশ পাইবে। এই জন্যই খাটা-খাটি। সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম এ-সময়ে কোন ব্যক্তি প্রত্যাশা করিলে, তাহাকে এক দিন না এক দিন হতাশ সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে হইবে। নানা উপদ্রবে সময় সময়

নিরাশ আসিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তোলে। প্রকৃতি-বশে লোক যাহা করে, তাহাতে লোকের শিক্ষা ও অভ্যাসের আবশ্যক করে না ; কেবল প্রকৃতিকে অভাব করিতেই অভ্যাস, অধ্যবসায়, যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক।

বঙ্গাব্দ—১১-১০-১৮] (৫৪) [সু

কি সংসারে—কি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে—কি ধর্ম্ম-রাজ্যে—কোথাও দুই ব্যক্তির মত এক হয় না ; কারণ, প্রকৃতিগত বৈষম্য-হেতুই জিনিসের পার্থক্য। কোনও অংশে যে জিনিসে পার্থক্য নাই, সেখানে দুইটাও নাই। এই জগতের অনন্ত শব্দ, স্পার্শ, রূপ, রস, গন্ধ—ক্রিয়ার অনন্তত্বের ফল ; এই অনন্ত হেতুই অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে ও থাকিবে। সুতরাং রুচির বৈচিত্র্যও জগতে সৃষ্টি কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। গুণ-ভেদে—সত্ত্ব, রজ, তম, কাল-ভেদে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, ভূত-ভেদে—ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুদ্‌ব্যোম এবং অবস্থা-ভেদে—দিবা-রাত্রি ভেদ ও চন্দ্র-সূর্য্যাদির গতি-বিধির পার্থক্য আছে ও থাকিবে। কোন সময়েই ক্রিয়া বর্ত্তমানে দুই ব্যক্তি এক

হয় না। ক্রিয়ার অভাবে সকলই এক হওয়া স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ।

আবার ক্রিয়া-ভেদে জ্ঞান ও ভাবের ভেদ—শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধাদি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ভেদ এবং এই ভেদ নিয়াই জগতের যত-ইতি ভেদাভেদের বিচার ও বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন ভাবের হেতু। এক ব্যক্তিতেও বিভিন্ন সময়ে—বিভিন্ন ক্রিয়ায়—বিভিন্ন ভাব হয়; সুতরাং ভাবাভাবের ভাল-মন্দ বিচারও ক্রিয়ার ফল। ক্রিয়া-রহিত অবস্থায় ভাবাভাব কিছুই নাই, মনও নাই, মতভেদও নাই। এই ভেদাভেদ রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভেদাভেদ নিয়া দ্বন্দ্ব থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং ভেদাভেদের বিচার করিতে গিয়া কেবল ভেদ-বুদ্ধির বৃদ্ধিই করা হয়—যেহেতু ভেদ বুদ্ধিতেই অভেদকে ভেদ বুঝি।

ক্রিয়াই যখন ভেদের কারণ,তখন ভেদ-বুদ্ধি এক প্রকার থাকা অসম্ভব; ক্রিয়ার প্রকার ভেদে জ্ঞানের প্রকার ভেদ হইবে। এই জন্যই কথা-বার্ত্তা নিয়া রাত-দিন নিরর্থক ভেদ-বুদ্ধি বৃদ্ধি করার চেয়ে, কেবল ক্রিয়ার অভাবের একমাত্র নিদান-ভূত কারণ 'গুরু' এই শব্দ নিয়া থাকাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে 'অ—হ' নিয়া 'আমি'-জ্ঞান, সেই 'অ—হ'-এর অনেক উপরে 'হুঁ'-এর 'উ'; সুতরাং

'অ–হ' নিয়া যাহা কিছু বুঝি, তাহা সর্ব্বৈব ভুল বই ঠিক বুঝিব না।

তবে ভুল আর ঠিক,আমার জ্ঞানে যখন যেরূপ থাকে, তখন সেইরূপই বুঝা যায়। আমি যখন ভুলে, তখন আমার জ্ঞানে ভুলই ঠিক; আবার যখন ঠিকে, তখন ঠিকই ঠিক। এই রকম ভুল আর ঠিক বুঝাও আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা, আমি যখন যেমন, তখন তেমনই—আর জ্ঞানও সেইরূপ, ধারণাও সেইরূপ—ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া-কার্য্যও সেইরূপই। আমার ভুল ও ঠিক সেই জ্ঞানানুরূপ ভুল ও ঠিক ধারণা হয়।

ক্রিয়ার খর্ব্ব না করিয়া, ভুল আর ঠিক বুঝাইতে গেলে ক্রিয়ানুরূপ ধারণায় যাহা কিছু বুঝা যাইবে, তাহা ঠিক হইলেও ভুল বুঝিবে। বালক বা বৃদ্ধকে, তাহার প্রকৃতির বিপরীত বুঝাইতে গেলে কিছুই বুঝান যায় না; বর্ত্তমান ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন না করিয়া বাক্য-ভাষায় ধর্ম্মের উপদেশ দিলে কোনও ফলই ফলে না। 'গুরুর' অবস্থায় জীব না যাওয়া পর্য্যন্ত 'গুরু' বুঝান কেবল উপহাসাস্পদ হইবার কথা। তবে জীব যে অবস্থার, তাহাকে সেই অবস্থার কথা বলিলে সে অনায়াসেই বুঝে। আমি যদি সমস্ত দেশব্যাপী সকলকে উদর-দেবতার পূজা করিতে পরামর্শ দেই, তবে বল—কে না বুঝিবে? কারণ, এ

দেবতার পূজা প্রাণী মাত্রই করিয়া থাকে। এই জন্যই দিন দিন পঞ্চোপচার, ষোড়শোপচার এবং অনন্তোপচারে ইহার পূজা-বিধি আবিষ্কার হইতেছে। যতকাল সৃষ্টি আছে, ততকাল এ দেবতার পূজা হইবে। প্রকৃতি অনুসারে সকল প্রাণীরই এই পূজা করিতে স্বতই ইচ্ছা আসে; যেহেতু 'শরীর-আমি', এই দেবতার পূজা না করিলে কিছুতেই রক্ষা পায় না। 'গুরু-পূজা' সেইরূপ আবশ্যক বোধ হইলে, 'গুরু-পূজায়' যে কি অপার আনন্দ তাহা অনায়াসেই অনুভব হইত।

বঙ্গাব্দ—১৪-১০-১৮ (৫৫) [জ

দেখিলাম—কেবল বৃথা অভিমান ও অহঙ্কার নিয়া আমরা রাত-দিন বাস করি; আমি করি, আমি বলি, আমি বুঝি বলিয়া কত না অহঙ্কার করি। ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে যখন যে অবস্থা ঘটে—সেই অবস্থা অনুসারেই সুখ-দুঃখ ভোগ করি ও ভাল-মন্দ বিচার আসে; অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার পরিবর্ত্তন হয়—তাহা অহংকারে বুঝিতে দেয় কই? আমি সুখ-দুঃখ ভোগ করি; আমি ভাল-মন্দ বিচারের কর্ত্তা। আমার ইচ্ছা-

অনিচ্ছা কিছুই যে, ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে অপেক্ষা করে না, তাহা আমি বুঝি কই? ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে বুঝিতে দেয়-ই বা কই? আমি ক্রিয়া বা ভাবের পুতুল—তাই অনন্ত সময়ে অনন্ত অবস্থা ও অনন্ত জ্ঞান; আবার সেই জ্ঞানানুরূপ বিধি-অবিধি। তাই তোমাকে লিখিয়াছিলাম যে—যে পর্য্যন্ত ক্রিয়ার অতীত অবস্থার 'আমি'-জ্ঞান না আসে, সেই পর্য্যন্ত 'ক্রিয়া-মূলক বা ভাব-মূলক আমি' নিয়া যে কোন বিষয়ই নিরূপণ করি না কেন,তাহা ভুল হইবে। জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া বায়ুকে শীতল বোধ করি, এটা কি ঠিক মাপ হয়? আবার কিছুক্ষণ পরেই জ্বর ছাড়িয়া গেলে, সেই বায়ুকেই গরম বোধ করি; সুতরাং 'ক্রিয়া-বিশিষ্ট-আমি'র পরিমাপ কোনও অবস্থায়ই ঠিক নয়। এই জন্যই লিখিয়াছিলাম –'আমার স্বরূপাবস্থা' না বুঝা পর্য্যন্ত যাহা বুঝি সকলই ভুল বুঝি; কারণ, আমার ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে আমার বোধ্য-বিষয় নানা সময়ে নানা রকম বুঝি,—তবু প্রাণ বলিতে চায় না যে বুঝি না। কেবল 'হুঁ'-র 'উ'-র ঘাটে—'গুরু'-শব্দ উচ্চারণ করিয়া অথবা 'মূল-মন্ত্র' বা 'গুরু-বীজের' দ্বারা ঐ স্থানে গেলে এক প্রকারই বুঝি; তখন আর ভিন্ন-বোধ, ভিন্ন-জ্ঞান থাকে না। পক্ষান্তরে—ভাব বা ক্রিয়া-মূলে বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হইলে ঐ অবস্থাকেই বেঠিক বুঝি। এ-

জন্যই ঠিক্-বেঠিক্ নিরূপণ করিতে হইলে নিজে ঠিক্ কি বেঠিক্, তাহা ঠিক না করিয়া ঠিক বুঝাটা ভুল হয়। যাহা হউক, আমার বিশ্বাস তোমাদের হাতে যে, 'গুরু-বীজ' আছে, তাহা দিয়া প্রত্যেক বিষয় পরিমাপ করিয়া ঠিক্-বেঠিক্ নিরূপণ করিলে, আমার এত বৃথা জল্পনার দরকার হয় না।

আমার বিশ্বাস যে, তোমাদের আমি যাহা বলিয়া দিয়া আসিয়াছি—তাহাতে আমার কাছে জানিবার বা বুঝিবার যে কিছু আছে, তাহা বোধ হয় না। 'গুরু-বীজ' ও 'মূলমন্ত্র' ঠিক মত করিলে, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই। যখনই যে বিষয়ে প্রশ্ন মনে উদয় হয়, ভিতর হইতেই আত্মারাম উত্তর দেন, ইহা আমি বহুকাল যাবৎ দেখিয়া আসিতেছি। যে কোন হিন্দু শাস্ত্রই পাঠ করা যাউক, আধুনিক টীকাকারদের টীকা না দেখিয়া মূল-সূত্রগুলি নিয়া নিজে নিজে মীমাংসা করিলে ভাল মীমাংসা হই বে

বঙ্গাব্দ—১৪-১০-১৮] (৫৬) [সু

এ পর্য্যন্ত বহু বাক্য ব্যয় করিয়াছি ; চিন্তা করিয়া দেখিলাম—তাহাতে কোনও ফল দর্শে নাই। অনেক দিন যাবৎ কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম ; বিশেষ কারণ খুঁজিয়া পাই না, অথচ বাক্য ব্যয়েরও ত্রুটি নাই। এবার চিন্তা করিয়া দেখিলাম—'আমি ও গুরু' এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ? দেখিলাম—আমি একটা অস্থির প্রবাহের ফল—প্রতিনিয়ত প্রবল বেগে আবর্ত্তমান। গুরু, যেরূপ সূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম ক্রিয়ার অবস্থা, যে অবস্থা প্রতিনিয়ত ব্রহ্মের সহিত সংযোগ বিয়োগ হয়, উহা আমার জ্ঞানে ধারণা হয় না। ব্রহ্ম-জ্ঞানই গুরুর একমাত্র জ্ঞানের বিষয় ; আমার জ্ঞানের বিষয় - দৃশ্যমান জগৎ, যাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়। গুরু ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় আমাকে বুঝান ; আমি ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দিয়া ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় বুঝি। কাযেই উভয়ের মধ্যে জ্ঞান-গত পার্থক্য ও জ্ঞেয় (বিষয়) ভেদ।

যাহার আর রকম-ভেদ নাই—যেখানে আর কোন রকমই নাই - তাহা রকমে রকমে বুঝাইতে গেলেই বিষয় আসিয়া পড়ে। বিষয় বাদ দিয়া আর কোন রকমেই 'বিষয়ী-আমির' বুঝিবার অধিকার নাই। তাই আজ

আমি তোমাকে বলি যে—আমি যখন বিষয়ী—বিষয় ভিন্ন আমার ধারণার বিষয় নাই—ধারণা করিলেও বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা বিষয়ানুরূপই গুরু ও গুরু বাক্য ধারণা করিয়া থাকি—যে অবস্থায় কিছুতেই বিষয় ত্যাগ করিতে পারি না—সেই অবস্থায় অন্য বিষয় বাদ দিয়া, 'গুরু'টাকেই আমার বিষয় করিয়া নেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তদবস্থায় 'গুরু' ভিন্ন যেন অন্য অবস্থা না থাকে; এরূপ না হইলে কিছুতেই বিষয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।

এইজন্য আমার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের বিষয় গুরু। আমার আহারে, শয়নে, উপবেশনে, জাগ্রতে, স্বপনে—গুরু; ক্ষুৎ পিপাসায় আমি গুরুর কাছে চাই। আবশ্যক বোধ আসিলেই,গুরুর নিকট আবশ্যকীয় জিনিস চাই; গুরুই দাতা, আমি গৃহীতা। আমার সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্ব বিষয়ে গুরু না থাকিলে, যেস্থলে গুরু ছাড়া অন্য বিষয় থাকে সেই স্থলেই আমি আমার মত। এই হেতু—প্রত্যেক ব্যাপারে শিষ্যেরা গুরুর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন আমার আমিত্ব-বিলোপের অন্য উপায় নাই। গুরু ছাড়া আমার অভিমত থাকিলেই সেখানে আর গুরু-বাক্য নাই—আমার আমির মত প্রবল; তখন গুরুর উপদেশও আমির মতই বুঝিব এবং আমি অনুরূপই কার্য্য হইবে—ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভাল-মন্দ, স্থান-অস্থান, পাত্রাপাত্র, যে কোন বিষয়ই আমির জ্ঞানানুসারে করি, তখনই আমার সব জাগিয়া উঠে। অতএব তোমাকে শেষ কথা এই বলিতেছি—যদি পার হওয়া একান্তই বাসনা থাকে, তবে সর্ব্ব-ব্যাপারেই 'গুরুকে' বসাইয়া সব কর; নচেৎ 'আমি-ব্যাধি' নাশ করিতে বিধিরও অন্য বিধি নাই।

আশ্রমে সকলেই 'আমাকে' ঠিক রাখিয়া 'আমির' বিবেচনা ও ধারণানুরূপ গুরু-উপদেশ শোনে—ইহাতে আমিত্বের কিছু মাত্র খর্ব্বতা সাধন হয় না—হইবেও না। নিজের অভিমত মত চলিয়া অন্ধের যেমন লণ্ডন নগর দেখিবার স্পৃহা কিছুতেই ফলবতী হয় না; মায়া-মোহে-অন্ধ জীবের সেইরূপ 'আমি-জ্ঞানে' আমি জ্ঞানানুরূপ ব্যবহারে, কিছুতেই ব্রহ্ম-জ্ঞানও লাভ হইতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক ব্যাপারে, এমন কি প্রতি শ্বাসে—আমার নিজত্ব ত্যাগ করিয়া গুরুর মত গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কেবল যে সকল ব্যাপার আমির জ্ঞানে সম্পন্ন হয় না—স্বতই প্রকৃতিবশে সম্পন্ন হয়, সেই সব ব্যাপারে গুরুর আদেশ অপেক্ষা করে না। যেখানে 'আমিত্ব' কার্য্যের প্রযোজক, সেইখানেই 'গুরুর' আদেশ অপেক্ষনীয়।

বঙ্গাব্দ—১৯-১০-১৮] (৫৭) [সু

হঠাৎ—মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের সূত্র মনে পড়িল। তিনি যে বৈশাম্পায়নকে ভেদ-জ্ঞানের হেতু ও জগৎ-ক্রিয়াময় না বুঝিবার কারণ বুঝাইয়াছেন, আমি আজ তাহাই চিন্তা করিতে ছিলাম। দেখিলাম—এ-জগৎ মাত্র এক ব্যক্তি বা এক বস্তু—নিজ শক্তি-প্রভাবে অনন্ত-প্রকারে—অনন্ত-পদার্থরূপে বিকাশ পাইয়া, অনন্ত-খেলা খেলিতেছি। এক ব্যক্তির বা এক বস্তুর শক্তি-প্রভাবে অনন্ত না বুঝিয়া পৃথক পৃথক বোধ বা ভেদ-জ্ঞান আসাতেই যাতনার কারণ হইয়াছে। এই ভেদ-জ্ঞানের কারণ—বিভিন্ন বস্তু বলিয়া ধারণা; বিভিন্ন বস্তু ধারণার কারণ—সূক্ষ্ম ও স্থূল এবং দেশ-কাল-জ্ঞান। একটা বস্তুই ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুদ্ব্যোম এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত, আবার এই পাঁচ প্রকার হইতেই অনন্ত প্রকার। স্থূল ও সূক্ষ্ম হেতু বায়ু, তেজ, জল, মৃত্তিকা ইহাদের পৃথকত্ব অর্থাৎ বায়ুটা কেবল শব্দের দ্বারা ও ত্বকের দ্বারা অনুভব করিতেছি; তেজ, জলাদি—শব্দ, ত্বক্‌ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতেছি। এই বুঝিবার ভেদেই আমরা উহাদিগকে ভিন্ন-বোধ করিতেছি এবং ভিন্ন-বোধ হইতেই সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, আসক্তি-অনাশক্তি প্রভৃতি নানা প্রকার

ভেদ-বোধ জন্মিতেছে এবং এই ভেদ-জ্ঞানই সমস্ত যাতনার কারণ।

আমরা ব্যক্তি বিশেষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মজ্জা, মাংস, রক্ত, অস্থি, পঞ্জর, নখ, চুল ইত্যাদির প্রকার ভেদে নানা প্রকার দেখি; বাস্তবিক পক্ষে সেই ব্যক্তির কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য হর্ষ-বিষাদ কোনও ভাবই প্রকাশ করি না। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হানিতে সেই ব্যক্তির জন্যই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি; ঐ ব্যক্তি ভিন্ন কোন বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। বিশেষ — প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকেই নির্দ্দেশ করি, তদ্ভিন্ন অঙ্গ বিশেষকে ধরিয়া শরীরকে বাদ দেই না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্নতা হেতু বিভিন্ন বস্তুতেও আমাদের লক্ষ্য থাকে না। অনেক সময়ে হাত-পা-মুখ-চুল ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় করি ও সেই ব্যক্তিকেই উল্লেখ করি। স্থূল ভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে যেমন কাহাকেও বিশ্বনাথ বলি, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে হাত-পা দেখিয়া ও শব্দ শুনিয়াও তাহাকে বিশ্বনাথই বলি, ঐ ঐ অঙ্গের পরিচয় করিয়া ব্যক্তি বাদ দেই না। সেইরূপ যদি ব্যক্ত-ব্রহ্মাণ্ডকে দেখিয়া—প্রত্যেক অবস্থায় সেই ব্রহ্মেরই পরিচয় করিতাম, তাহা হইলে এই ভেদ-বুদ্ধি-জনিত

পৃথক ব্যক্তি বা বস্তু-জ্ঞানে যে আসক্তি-অনাসক্তি রহিয়াছে, তাহার কিছুই থাকিত না, এবং তজ্জন্য সুখ-দুঃখও থাকিত না।

পক্ষান্তরে—এই যে জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি-আদি-জনিত যাতনা,তাহা কেবল ভেদ বুদ্ধিতে,পৃথক ব্যক্তি ও বস্তু-জ্ঞান হইতে ভোগ করিয়া থাকি। পৃথক বোধ না থাকিলে যে, অনিত্য বস্তুর অবস্থান্তর ও রূপান্তরেও, স্বরূপাবস্থার অবস্থান্তর ও রূপান্তর হয় না—তাহার জন্য দুঃখের কারণ থাকা কি সম্ভবপর? আমাদের এই ভেদ-বুদ্ধির বিশেষ কারণ এই যে, আমরা সীমাবদ্ধ হইয়া, সীমা-বিশিষ্ট-জ্ঞান নিয়া বাস করি; ব্রহ্মের অনন্ত ব্যাপকতা এই জ্ঞানে ধারণা করিতে পারি না। সুতরাং তন্মুলেই দেশ-কাল ভেদ হয় এবং দেশ-কাল-ভেদ হইতেই এস্থান, ওস্থান, এসময়, ওসময় জ্ঞান আসিয়া, ক্রমে এটা, ওটা, পৃথক বস্তু-জ্ঞান আনে। ঐ পৃথক বস্তু-জ্ঞানের মুলে স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে পৃথকত্বের গাঢ়ত্ব জন্মায়।

তুমি আর আমি প্রথমতঃ—কলিকাতা ও জগৎপুর এই দূরত্ব বোধ হইতে প্রথম পৃথক বোধ, পরে স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে এই দূরত্বের অবচ্ছেদে নানা পদার্থের বোধ জন্মে, এতদ্বারা পৃথকত্বের অত্যন্ত গাঢ়ত্ব জন্মাইল। বিশেষ—

সীমাবদ্ধ-জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষতাহেতু সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতা-বোধ আসিয়া ক্রমে পৃথক বোধ হইতে যে সব অবস্থার উৎপত্তি করিয়াছে, সে সব জন্মাইতে লাগিল ও চিন্তা-ভাবনা, ভাল-মন্দ আবির্ভাব-তিরোভাব ইত্যাদি নানাবিধ ভাব আসিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল ও নানা যাতনার কারণ হইয়া উঠিল। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় কেবল এক পদার্থেরই অনন্ত প্রকার বিকাশ ও অনন্ত ভাবে আবার বিলয়; ভাল-মন্দ সমস্ত জ্ঞানই কেবল সেই এক পদার্থ নিয়া, ইত্যাকার চিন্তা ও অনুধ্যান না থাকিলে, মায়া-মোহের হাত এড়াইতে জীবের কোন উপায়ই নাই। তবে ক্রিয়ার খর্ব্বতা সাধিত হইয়া—ক্রিয়া-রহিত অবস্থা হইলে- দ্বিতীয় পদার্থ, জ্ঞানকে অধিকার করে না—তদবস্থায় এই সব চিন্তাও আসে না।

আজ ভেদ-বুদ্ধি নিয়া, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তোমাকে অপূর্ব্ব উপাদেয় সূত্রের বিষয় লিখিলাম। সাক্ষাৎ হইলে এই বিষয়টি—'মোহ কি ভাবে উৎপত্তি হইয়াছে,' তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

বঙ্গাব্দ—২৩-১০-১৮] (৫৮) [সু

আমি ক্রিয়া-প্রভাবে ক্রিয়ানুরূপ জ্ঞান নিয়া, একই অনন্ত হই। ক্রিয়া বা শক্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই আমার পরিবর্ত্তন। ক্রিয়া-রহিত অবস্থায় আমার বাহ্য-জগতের কোন জ্ঞানই থাকে না ও বাহ্য-জগৎ থাকে না। ক্রিয়া-পার্থক্যহেতু যেমন আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, অস্থি, পঞ্জর, নখ্, চুল, নাড়ী, ফুস্ফুস্ ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের বস্তু ও বিভিন্ন ক্রিয়ার যন্ত্র—তেমনি আবার ক্রিয়া-ভেদে আমার ভাব,বুঝা-বুঝি, দেখা-শুনাদি সমস্তেরই ভেদ হয়। সুতরাং শক্তি বা ক্রিয়াই আমার জ্ঞান বা যতকিছু পার্থক্যের হেতু। সংসর্গ বা বস্তু-মূলে আমার যে জ্ঞানের ভেদ হয়, তাহাও ক্রিয়াগত বৈষম্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। সর্ব্বাবস্থায় আমি 'গুরু'তে না থাকিলে আমাতে সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, শোক-মোহ সকলই বর্ত্তমান।

আমি যে দেখি-শুনি, বলি-চলি—সকলই ক্রিয়ার শক্তি; আমার আত্ম-পরও ক্রিয়ার শক্তিতে বুঝায়। জগৎ ক্রিয়ারই ফল, সুতরাং ক্রিয়ায় থাকিলে জগৎ থাকিবে। ক্রিয়া বর্ত্তমানে চোক্, কাণ, নাক, ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া

কৌশল করিয়া রোধ করিলেও, আমার মনে জগৎ থাকিবে। সুতরাং হয় ক্রিয়ার খর্ব্বতা সাধন, না হয় যে দেহে ক্রিয়ার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মাবস্থা, তদ্দেহের অনুধ্যান অর্থাৎ 'গুরু-চিন্তা' আবশ্যক। অথবা ক্রিয়া বর্ত্তমান রাখিয়া না পারিলে, সর্ব্বেব ক্রিয়ার ফল এবং এক পদার্থকেই অনন্ত বুঝিতেছি, অনুধ্যানের দ্বারা এ ধারণা দৃঢ় করা উচিত। অর্থাৎ যদি 'গুরু-গুরু' করার শক্তির অভাব হয় কিম্বা 'মূল-মন্ত্র'-মূলেও ক্রিয়ার খর্ব্বতা সাধন করিতে অক্ষম হই, তদবস্থায় এই ক্রিয়াময়-জগৎ কেবল এক ব্রহ্মেরই ক্রিয়া প্রভাবে অনন্ত প্রকার বুঝাইতেছে—প্রত্যেক অবস্থায় এই অনুধ্যান রাখা কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন ঋষিরা অন্য উপায় কিছু করেন নাই।

বঙ্গাব্দ—৭-১১-১৮ (৫৯) [সু

জগতের যত পরিবর্ত্তন সমস্তের মূলে ক্রিয়া; আবার সেই ক্রিয়ার ফলই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; আবার শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের ভেদেই সকল ভেদ। সুতরাং আদর্শ বা অনুধ্যানের বিষয় যেরূপ হইবে, আমাকে সেইরূপ হইতেই হইবে। অনুধ্যানের তারতম্যে আমাদের ক্রিয়ার পার্থক্য হয়; অর্থাৎ অভিনিবেশ-পূর্ব্বক অনুধ্যান অথবা চঞ্চল অবস্থায় ক্ষণিক অনুধ্যান ইত্যাদি প্রকার-ভেদে, বস্তুর ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়ার ভেদ হয়। মোটকথা—যে বস্তু আমি অনুক্ষণই চিন্তা করি, সেই বস্তু অনুরূপ আমার সমস্তই হইবে। তবে অনেক স্থলে দেখা যায় যে, আমার চিন্তা বা অনুধ্যানকে অপেক্ষা না করিয়া, কতকগুলি বিষয়ে আমাদের স্বতই অনুধ্যানের স্পৃহা আসে; যথাঃ—আহার্য্য বস্তু, স্ত্রী-পুরুষাদির চিন্তা। কিন্তু দেখা যায় যে, প্রাণীবর্গের মধ্যে আহারের ভেদ আছে; ইহার কারণ পূর্ব্ব জন্মের ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়া আমাদের দেহে বর্ত্তমান। এই জন্যই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে বা ক্রিয়ানুসারে—আমরা আহার্য্য বস্তুর অনুধ্যান করি ও আহার করি। কিন্তু ইহাও দেখা

যায় যে, আমাদের প্রকৃতি অনুরূপ আহার্য্যের যেখানে অভাব, সেখানে একেবারে আমার প্রকৃতির বিপরীত নয়, এরূপ অন্য পদার্থ দ্বারাও প্রকৃতির অভাব পূরণ করিয়া থাকি। ইহাও দেখা যায়—যে বস্তু আমরা কোনরূপে প্রত্যক্ষ করি নাই, তজ্জন্য আমাদের কোনরূপ ভাব বা ক্রিয়া অর্শে না। আবার যেই প্রত্যক্ষ করিলাম, অমনি সেই বিষয়ের ভাল-মন্দ সমস্ত আমার মধ্যে আসিয়া তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়া আমাকে আর এক রকম করিয়া তোলে। সুতরাং যেই আমি গুরু বা গুরু-ভক্ত-জিনিস ভিন্ন অন্য বস্তুর অনুধ্যান করি, তখন আর আমার অন্যানুরূপ না হইয়া থাকিবার যো নাই।

মোটকথা—বুঝ্ থাকিলে বোধ্য বস্তুও থাকিবে এবং বোধ্য বস্তু অনুরূপ আমার প্রকৃতিতে সব থাকিবে। অতএব চিন্তা করা উচিত—বুঝ্‌তে হইলে কি বুঝা উচিত।

বঙ্গাব্দ—১০-১১-১৮] (৬০) [ন

* * * অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম—আমি একটি বহুরূপী; ঠিক বহুরূপী। যখনই যেরূপ অবস্থায় বা যে ব্যাপারে যোগ হই, তখন আমি ঠিক তাই; আমার এখন নির্দ্দিষ্ট স্বরূপ অবস্থা নাই। আমার অনন্ত অবস্থা; অনন্ত অবস্থার সংযোগে—প্রকারও অনন্ত হইতেছে; সুতরাং লোকের পক্ষে আমাকে ধরা, চেনা, বুঝা একেবারেই অসম্ভব। আমাকে বুঝিতে গেলে, আমার কোন্ অবস্থা স্বরূপ অবস্থা তাহা কি বুঝিবে? জীবের পক্ষেও ভীষণ বিপদ। আনন্দ-নিরানন্দ বা হর্ষ-বিষাদ, লোভ-মোহ নানা ভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বরূপ-ভাব কি, ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম—বিভিন্ন বস্তুতে বা বিভিন্ন অবস্থায় বা ভাবে সংযোগ হইয়া বা অনুধ্যান করিয়া এই বিভিন্ন অবস্থার উৎপত্তি হইতেছে। কেবল আমি যখন 'গুরু' ভাবি বা 'গুরু' বুঝি, তখনই আমাকে সকলে এক ভাবে দেখে—তখনই আমাকে যেন আর বহুরূপী মনে করে না।

ভাল,—আমি যে মা, বাবা, ভাই, বন্ধু, দাদা, নাতিন্, নাতি, নাতি-বৌ, পিসি, মাসী ইত্যাদি কুটুম্বের সঙ্গে সংযোগ হইয়া কুটুম্বিতা করি এবং আত্মীয়তায় গলিয়া

গিয়া হরে-রাম হরে-রাম করি—বাবা! সেই মূর্ত্তিটি তুমি কেমন সুন্দর দেখ? আমাকে লিখিয়া জানাইবে। আবার যখন দীন-বন্ধু - অনাথ-বন্ধু বলিয়া চীৎকার করি অথবা অমুক, অমুক করিয়া পাগল হই—এই তিন মূর্ত্তির কোন্ মূর্ত্তি তোমার পক্ষে মধুর, তাহা জানিতে চাই। ……, সেই মূর্খ দুর্ভাগার কি শান্তি সম্ভবপর? যে, গুরু ভুলিয়া অন্য বাসনায় কাজ করে,—সে, যাহাই করুক না কেন, তাহার পরিণাম গরল। তাহাকে কি যাইবার দিনে অনুতাপানলে দগ্ধ, অথবা মায়া-মোহে মুগ্ধ হইয়া হা হতোঽস্মি করিতে করিতে যাইতে হইবে না? যে, 'গুরু' ভিন্ন অন্য বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত—তাহার কি পুনরাবৃত্তি হইবে না? যে, 'গুরু'-ভাবনা দ্বারা সমস্ত ভাবের অভাব না করিয়া - নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া —ভব-ভাবে উন্মত্ত হইয়া—ভব-বাসনা নিয়া ইহ জগৎ পরিত্যাগ করে—যে, গুরু-চিন্তা-রহিত হইয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়া— ভ্রমেও এই নশ্বর শরীর যে, অলক্ষিত ভাবে, অনিশ্চিত কালে ধ্বংসশীল, তাহা চিন্তা করিয়া দেখে না—সে, মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়া—হায়! কি করিলাম, কোথায় যাইব—ইহা ভাবিয়া কি আকুল হইবে না? যে, গুরুকে ভুলিয়া ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী আত্মীয়ের

আত্মীয়তায় বদ্ধ—সে কি, অন্তিমের দিনে সেই আত্মীয়-বিচ্ছেদ-জন্য অপার দুঃখ ভোগ করিয়া যাইবে না? যে, গুরুকে ভুলিয়া বিষয়-সুখ সম্ভোগ-তৎপর হয় এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ভোগ-স্পৃহা দ্বারা ঘোর মোহ-মুগ্ধ হইয়া পড়ে—সে কি, অকাল-মৃত্যু-রূপ আসন্ন বিপদকে আলিঙ্গন করিবে না? বাবা! সব অবস্থায়ই দেখি যে, গুরু ভুল হইলেই যে-ভাবে, যে অবস্থায়, যে কার্য্যই করি না কেন, কেবল অন্ধকার ও হা হতোঽস্মি; হাতড়াইয়া দিনাতিপাত করিতে হয় এবং আদর্শ বা অনুধ্যানের বিষয়ের দোষ-গুণ অনুসারে দোষ-গুণ ও সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, যে কার্য্যই করি না কেন,—কর্ণধার-বিহীন নৌকা যেমন যে-ভাবেই চালান যাউক—চতুষ্পার্শ্বেই ঘুরিতে থাকে,—গুরু-জ্ঞান-বিহীন জীবও' সংসারে যে-ভাবেই থাকুক বা যে-কার্য্যই করুক, তাহাকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেই হইবে। বাবা! আজ কাল কেবল অমুক চিন্তার বিষয় নয় বলিয়াই, চিঠিখানা তোমার মত হইল না। সংসার নিয়া চিন্তা করিয়াই এই সমস্ত কথা হইল, খালি 'গুরু-গুরু' হইল না। সর্ব্বাবস্থায়ই গুরু, সর্ব্বোপদেশেরই সার গুরু; গুরু ছাড়িয়া যাহা ভাবি তাহাই লঘু, ইহা আর বুঝান হইল না।

বঙ্গাব্দ—১১-১১-১৮] (৬১) [সু

আমার দীন-বন্ধুরে ! তুমি ব'সে মম হৃদয়-মাঝে,
হৃদয়ের ধনে দে ব'লে।
নিদারুণ কলি কালে, তুমি না দিলে ব'লে,
কিছুতেই ভুল ঘুচে না, অনাথ-শরণ,
জীব যে রয়ে যায় ভুলে॥

এবার না বল যদি, বিধির বিধি ঘুচিবে ভুলে,
হবে না বাক্য রক্ষা, দেও হে ভিক্ষা,
দীনেরে নেওহে নাথ কোলে॥

গুরু-দক্ষিণা দিতে, 'বসন' হ'তে হবেনারে আর,
ঘুচিবে আশা-ভরসা, সব নিরাশা,
সার কেবল শুধু হাহাকার॥

তুমি সর্ব্বদাই সংবাদ জানিতে চাও; তাই আজ উপরের লিখিত গানটিতে তোমাকে সংবাদ দিতেছি। কহিবার কিছু নাই, বলিবার কিছু নাই, তবু বল—বল বল। কহিবার, বলিবার, দেখিবার, শুনিবার কেবল এক গুরু; এই এক শব্দ আর কতবার কহিব? কই আমি ত তেমন রুচি বা প্রকৃতির লোক নই যে, কেবল গুরু-গুরু-গুরুই কহিব, গুরু-গুরু-গুরুই করিব। যত

করিব ততই উন্মাদ হইয়া আরও করিতে ইচ্ছা হইবে। যে, আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা খোঁজে—যা'র মা, বাবা, ভাই, বোন্, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি বর্ত্তমান ; যা'র ঘর, দরজা, বাগান, বাড়ী ; যা'র গরু-বাছুর, ঘোড়া, গাড়ী—তা'র কি আর ঐ গুরু-গুরু শব্দ করিবার অবকাশ থাকে ? বিশেষ—আমার মত অথবা আমার মন মত শব্দ ফেলিয়া, মনকে বিনাশ করে যে—তা'র কথা মন কেন বলিবে ? মন যাহা হইতে উদ্ভব, যাহা দ্বারা পরিপুষ্ট, তাহাকে ছাড়িয়া—যৎ-কর্ত্তৃক ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও অভাব হয়, তাহার নাম করিবে কেন ? বাবা ! আর ত 'গুরু-গুরু' করিতে পারি না ; করিতে লজ্জাও করে, কারণ কতবার 'গুরু-গুরু' করিলাম ; কই আমার কথায় ত কেহ গুরু-জ্ঞান লাভ করিল না।

বুঝেছি, বুঝ্তে আর বাকী নাই ; বিশেষ—আজ 'সাপুনঃ' করিয়াছি, অতিশয় নেশা—তাই দিশা পাইয়াছি, আমার গুরু-জ্ঞান হয় নাই। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান লাভ কি সম্ভবপর ? 'বিশা' আমার দিশা জন্মাইয়া দিয়াছে। 'বিশা' ত দিশার জন্যই গুরু-গুরু শুনিতে চায়। আমি বে-দিশা, তাই 'বিশার' দিশা জন্মাইতে পারিলাম না। তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমি তোমার জন্য অস্থির ও পাগল, তবুও তোমার

গুরু-জ্ঞান হয় না? আমি পাহাড়ে থাকি, আমার প্রাণ তোমার কাছে কলিকাতায়। তোমার গুরুর দিব্যি, তুমি একবার চক্ষু বুজিয়া 'গুরু' বলিয়া প্রাণ খুলিয়া দেখ দেখি। তুমি আমাকে ভুলিয়া গেলে, আমি এক মুহূর্ত্তও এ-ভারতে থাকিব না; বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হইয়া ম্লেচ্ছ দেশে গিয়া জন্ম গ্রহণ করিব। গুরু প্রাণ দিয়াও প্রাণ না পাইলে গুরুর কোন শক্তি নাই; ইহা এই কলিতে প্রমাণ হইয়া ম্লেচ্ছাচার পরিপূর্ণ হইবে।

তোমার চেয়ে প্রিয় জিনিস এ-সংসারে বর্ত্তমান নাই, তোমার দিব্যি, আমি গুরু-তত্ব কিছুই বুঝি নাই। তবে মা থাকিতে ও মা'র অভাব হওয়ার পরেও—মা'র কথা মনে হইয়া এইটুকু বুঝি যে—প্রাণ বিনিময় করিয়াও বুঝা যায় না।—"দয়াল গুরু-ধন তারে কি লাগুল (নাগাল) পাব,—কবে রাঙ্গা পায়ের নুপুর হয়ে আমি চরণে বাজিব" ...এই গান—মা, জগতের সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াও গাহিত। ইহা দ্বারা বুঝিতাম—জগতের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ হইলেও গুরুকে বুঝা যায় না। পরে বুঝিলাম—শরীর-জ্ঞান-পরিশূন্য না হইয়া, 'তাঁহাকে' বুঝা যায় না, এই বুঝিয়া মা দেহত্যাগ করিল।

বাবা! আমি তোমায় কি করিয়া বুঝাই? তবে 'তাঁরে' ছাড়া অন্য বুঝিলে বুঝ্ আর খুচিবে না—এই বুঝিয়াছি।

বুঝ্ অনন্ত,—আমারও অনন্ত জন্মের কারণ ঘুচিবে না। বুঝ্ অভাব না হইলে যখন বুঝা-বুঝি ঘোচে না—তখন বুঝ্ থাকিতে, বোধ্য-বস্তুর অভাব হইবে না। সুতরাং বুঝ্ থাকিতে 'গুরু' বুঝা যায় না, বুঝানও যায় না। 'গুরু' বুঝটা বুঝের অতীত জিনিস; যেহেতু—গুরু বুঝিলেই বুঝা ঘোচে। অতএব গুরু বুঝাটাকে বুঝা বলি না। ন্যায়ের সূত্রে—যে পদার্থ যাহার অভাবকারী, সে তাহা নয়। এখন ঘোর নেশা, এই নেশার প্রবল অবস্থা থাকিতে আর বুঝা-বুঝিটা ভাল লাগে না।—

কেবল গুরু-গুরু বল, নৈলে মন ঘুচ্‌বে না ভুল।
বলাবলি ছেড়ে দিয়ে, কেবল মন বল একই বোল।
গুরু বলে কাঁদ না মন, যদি আপনা চাওরে ভাল।
গুরু ভুলে ঘট্‌লো ভুল, ভুলে ভুলে চিরকাল গেল।
ক্রমে কাল নিকট হ'ল, ওরে শেষের উপায়
কি হ'বে বল?
'বসনেরি' কর্ম্ম ফল, 'বিশ্বনাথও' বিরূপ হ'ল।
'বিশা' বুঝেই দিশা গেল, রব এ-ভবে আর কতকাল?

বঙ্গাব্দ—১৬ ১১-১৮] (৬২) [সু

লিখিয়াছ –'সর্ব্বাবস্থায়ই গুরুর অপার করুণা দেখ;' আর লিখিয়াছ—'মোহের কি অপার মহিমা।' আজ তোমার এই দুই কথা ধরিয়াই তোমাকে অনেক বিষয় বলিবার আছে। আমি আমার প্রকৃতি অনুরূপ আলাপ, ব্যবহার ও আবশ্যকীয় বিষয় পাইলেই সন্তুষ্ট ও করুণা বুঝি। দ্বিতীয়তঃ—আমার প্রকৃতির বিপরীত ব্যবহারকেই কষ্টকর ও নির্দ্দয়তা বুঝি। রুগ্ন-বালক পিতা-মাতার নিকট রোগ-বৃদ্ধিকারক কু-পথ্য পাইলেও মা'র ভালবাসা অনুভব করে ও সন্তুষ্ট থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এমতস্থলে পিতা-মাতার ব্যবহার বালকের প্রতি প্রকৃত দয়া না হইয়া নির্দ্দয়তা এবং অকাল মৃত্যুর কারণ হয়। এতাদৃশ মূর্খ দুঃশীল পুত্রকে পিতা-মাতা সংশোধন করিতে চেষ্টা না করিয়া আদর দিলে—সে দয়া বুঝিলেও, বাস্তবিকপক্ষে শত্রু অপেক্ষাও তাহার অনিষ্ট করা হয়। অপরপক্ষে—যে পিতা-মাতা রুগ্ন-পুত্রকে, পুত্রের প্রাণের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া, কিছুতেই কু-পথ্য দেয় না ও তিক্ত-কষায় প্রভৃতি ঔষধ, তাড়না করিয়া ভক্ষণ করায়, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে দয়ার কার্য্য করিয়া থাকে—যদিও বালক সেইরূপ ব্যবহারকে কষ্টদায়ক বলিয়া মনে করে। দুঃশীল

মূর্খ পুত্রকে পিতা-মাতা সু-শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে তাড়না করিয়া থাকে, তাহাও পুত্রের পক্ষে পিতা-মাতার অপার দয়া বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মোহেও অনেক সময় পিতা-মাতার প্রকৃত দয়াকে নির্দ্দয়তা বুঝাইয়া, নির্দ্দয় ব্যবহারকে দয়া বুঝাইয়া দেয়। সুতরাং পরিষ্কারই দেখা যায় এই যে, দয়া বুঝি উহাও মোহ। তুমি যে মোহের কথা লিখিয়াছ,—উহা কোন্ প্রকারের মোহ?

আমি কি প্রকৃতই তোমাদিগকে দয়া করি, না তোমাদের সহিত নির্দ্দয় ব্যবহার করি? যে পিতা জানে যে, অরণ্য মধ্যে বহুল হিংস্র জন্তু বাস করে, সেই পিতার ঐরূপ অরণ্য মধ্যে পুত্রকে প্রবেশ করাইয়া দিয়া—দূরে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকা কি দয়ার কার্য্য? ভারত জন-শূন্য অরণ্য, কেবল হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান; বিন্দুমাত্র স্থান নাই, যেখানে হিংস্র জন্তুর অভাব। কেবল এক 'গুরু'র হৃদয়ই নিরাময় আনন্দ-ধাম। তবে কি তুমি কলিকাতা থাকিয়াও গুরুর হৃদয়ে বাস কর? 'গুরু'র বিশাল উরঃ বা বক্ষঃস্থল জগৎব্যাপ্ত, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা 'তাঁহাকে' সর্ব্বত্রই দেখিতে পায়, তা'র পক্ষে গুরু ভিন্ন অন্য স্থানাভাব। সে সর্ব্বাবস্থায় গুরুর অপার দয়া অনুভব করে। 'পূর্ণানন্দ' সর্ব্বত্র গুরু দেখে না,

তাই এ-কথা, ও-কথা, দশ-কথার মধ্যে গুরু একটা বলে; নইলে কেবল গুরু-গুরুই বলিত। তুমিও অহর্নিশ গুরু-গুরুই শুনিতে। এক বুঝে যা'র অন্য বুঝা-বুঝি-রহিত হইয়াছে, সে এক কথা বই অন্য কথা কি বলিবে? অন্য বলিবার থাকেই বা কি?

কবে—কে আমার হইয়া, আমাকে সেই এক কথা বলাইবে, এক কথা বুঝাইবে? এক ভাবে থাকিব, এক গান গাইব; জগতের যত বিভিন্নতা সব দূর্ হইবে। লিখিয়াছ—'না ভাবিলেও ভাব আসে, না দেখিতে চাহিলেও চক্ষু দেখে, না শুনিতে চাহিলেও কর্ণ শুনে'— এ সব, যখন ভিন্ন বোধ থাকে—ভিন্ন-অনুধ্যান থাকে—দেহে ভিন্ন ক্রিয়া বর্ত্তমান ততক্ষণ। কিন্তু যখন অনুধ্যানের বিষয় এক, ক্রিয়াও এক প্রকার, তখন দেখিলেও ঐ এক দেখে, শুনিলেও এক শুনে, ভাবিলেও এক ভাবে। এ সকল রোগেরই একমাত্র ঔষধ 'গুরু'; যেহেতু—ঐ শব্দে দ্বিতীয় ক্রিয়া নাই।

আমি তোমার রুচি অনুসারেই তোমার হওয়ার জন্য ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, বাবা, চাচা, খুড়া, খুড়ী বলি— এ-কথা সত্যই। উল্লিখিত কুটুম্বিতা তোমার মধ্যে অভাব হইলে বলি কি না তাহা দেখিতেই আমার প্রবল ইচ্ছা। তুমি যেমন মোহ বুঝ; বুঝিতে গিয়া আমিও তেমন দেহ বুঝি,

বুঝাইতে গিয়া। দেহ-বোধ রহিত হইলে বুঝাইব কি, বুঝাইব কারে? উভয়ই রুগ্ন,—তবে রোগের ইতর বিশেষ আছে। সান্নিপাতের রোগী প্রলাপ বকে; উরুস্তম্ভ হইলে চীৎকার করে; উভয় রোগেই মৃত্যু সম্ভাবনা; তবে আসন্ন-মৃত্যু আর সময় গৌণে মৃত্যু, এইমাত্র পার্থক্য। বাবা! তুমি গুরুর অপার করুণা বুঝিয়া যে, শ্রীকৃষ্ণ ও মহামুনি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে এই ঘোর কলিতে অনায়াসে টানিয়া নীচে নামাইলা—ইহাতে একটু দুঃখিত হইলাম। তবে গুরু এই জ্ঞান পরিপূর্ণ হইলে—তোমার ঐ সব কথা, একবার কেন সহস্রবার বলিবার অধিকার আছে। কেননা,—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব জগৎসর্ব্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

বৎস! তুমি আমায় দোতালায় উঠাইয়াছ, তাহাতেই মাথা ঘুরায়; ইহার চেয়ে উপরে উঠাইলে, পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি 'বসন'; বসন বলিলেই সুখী; উহার উপরে না তোলাই ভাল। আমি বাপের আবদারে ছেলে—চিরকাল বাপের কোলে থাকি ইহাই আমার প্রবল বাসনা। বাপে আমাকে যথেষ্ট স্নেহ ও আদর করিতেন। আমার আশৈশব অভ্যাসের বিন্দুমাত্র

পরিবর্ত্তন হয় নাই—আমি তাই ভালবাসি। আমি অমুক বা অমুকের মত,—এ-কথাটা বড় কর্কশ মনে করি। তা'র চেয়ে, আমার মত আমার বাবা আর কাহাকেও ভালবাসে না - ইহা বুঝিলেই সন্তুষ্ট। একমাত্র পুত্রই আমার বাবার অনুধ্যানের বিষয়; আমার চিন্তাই চিন্তা, আমার কথাই কথা, আমার সুখেই সুখ, আমার আনন্দেই আনন্দ; আমাকে ছাড়া তাহার আর কিছু বলিবার নাই, ইহা ছাড়া আমি কিছু চাই না। অপরের কথাটা বলিলেও ত আমার কথাটা বাধা পড়ে। অপরের কথাটা না বলিয়া—আমার নামটাই গোপাল, নেপাল, হড়া, গড়া রাখিয়া ডাকাই ত ভাল হয়। আমাকে বাদ দিয়া একটা ভিন্ন বস্তুর নাম কহিলেই আমার রাগ আসে। তুমি যা' দেখ. শুন, বল, চল,—সকল অবস্থায় আমি না থাকিলেই, আমার ভাল লাগে না—রাগ হয়। আমার এই প্রসঙ্গটা বুঝিলে কি?

যে পর্য্যন্ত জীবের 'গুরু-জ্ঞান' - 'গুরু-গুরু' করিয়া পরিষ্কার রূপে না জন্মিবে, সেই পর্য্যন্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের জ্ঞান অভাব হওয়া অসম্ভব। এত কথা লিখি—কথার কথায় আছ বলিয়া বা রাখিয়াছি বলিয়া। কথার কথা হইতে তুলিয়া আনিলে তুমি বা কোথায়—আমি বা কোথায়? কিছুই নাই—কোন কথা নাই।

এ কথাটায় একটু ভয় হয় কি ? এ জন্যই হৈ হৈ করিয়া—আমি এক জন, তুমি এক জন—এই পার্থক্য, পৃথক শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছি ও চীৎকার দ্বারা পৃথকত্ব বর্ত্তমান রাখিয়াছি। এই হেতুই—দেখা-শুনা, বলা-চলা, এ-মোহের অভাব হয় না।

আকাঙ্ক্ষা ও আশার চরম কতদূর—চিন্তা করিয়া চিন্তায়ও পাই না। চিন্তার ধন চিন্তামণি যেমন চিন্তায় অসীম অনন্ত বোধ হয়—আকাঙ্ক্ষা ও আশাও বা বাসনা অনন্ত অসীম। যেহেতু—উভয়ে উভয় ব্যাপ্য-ব্যাপক বা আধার-আধেয় ভাবে অবস্থান করে। মনে বড় সাধ ছিল যে, আমার ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে—'গুরু-গুরু' চিন্তার অবস্থাটাই মধুর মনে করিবা এবং তদ্বারা বুঝিব আমার বন্ধনটা অনেক শিথিল হইয়াছে। চিন্তা করিয়া দেখিলাম—টানায় পড়িয়া "পইড়ান আউল" লাগিয়া শক্ত গিরা পড়িয়াছে ; খোলা আমার পক্ষে সহজ নয়।

বঙ্গাব্দ—১৮-১১-১৮] (৬৩) [সু

সর্ব্বদাই মনে হয়—বিষয়ীরা বিষয়-সলিলে নিমগ্ন হইয়া জলের উপরিভাগের বিষয় একেবারেই অবগত হয় না। তজ্জন্যই বিষয়ে বীতস্পৃহ নহে,—বিষয়ানুরূপ ব্যাপারে তৃপ্তি-বোধ করে; অর্থাৎ যে বিষয়ে থাকা যায়—তাহার বিপরীত বিষয়ে অনুধ্যান বা চিন্তা না থাকিলে, তদ্বিষয়ের দোষ-গুণ বুঝা অসম্ভব। শুধু অন্ধকারে থাকিলে, আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য বুঝিয়া, কোন্‌টি সুখের বা দুঃখের, তাহা নিরূপণ করা যাইত না। সেইরূপ ভগবৎ-চিন্তা বা পরিণাম-চিন্তা-বিহীন লোকেরা বিষয়ে থাকিয়া, বিষয়ের মধ্যের ভাল-মন্দ নিয়াই ব্যস্ত। কোনও অবস্থায়,কেহই দুইটা বিপরীত বিষয়ের তুলনা না করিয়া, ভাল-মন্দ নিরূপণ করিতে পারে না। পূর্ব্বে যে লেখা-পড়াতে উন্মত্ত ছিলে ও সংসার চিন্তায়ই ব্যস্ত ছিলে—তখন দিন গেল কি হইবে—এ-চিন্তা কোথায় ছিল?

যতই গুরু-গুরু করিয়া গুরুর নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই বিষয় বিষবৎ বোধ হইবে; তখনই এ-জগৎ ভ্রান্তি, প্রাণে প্রকৃতরূপে জাগরূক হইবে। গুরু-জ্ঞান-পরিশূন্য

হইলে বিষয়ে যাতনা কোথায়? বিষ-কৃমি বিষকেই অমৃত মনে করে। সেই প্রকার স্থলচর ও জলচর প্রাণী, যথাক্রমে জলে ও স্থলে ভীষণ যাতনা বোধ করে। প্রকৃতির বিপরীত অবস্থা কাহারও পক্ষে সুখকর নয়। আবার চিন্তানুধ্যান অভ্যাস-মূলে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইলে—পূর্ব্বাবস্থা ও পূর্ব্ব-স্মৃতি দুঃখ-দায়ক হয়। আমার এখনও বিষয়টা পূর্ণ মাত্রায় অভ্যস্ত ও প্রকৃতিগত হয় নাই বলিয়াই, সময়ে সময়ে যাতনা বোধ করি ও সব দিন এক অবস্থা থাকে না। ষণ্ডামার্কের উপাখ্যান অনেক দিনই মনে পড়ে। আশ্রমবাসীদের সংসর্গে ও তাহাদের কার্য্য-কলাপ অনুধ্যানে, আশ্রম-বাসীদের প্রকৃতির অনুরূপ প্রকৃতি হইলেই, আমি তাহাদের মত হইব, তাহারা আমার মত হইবে; আর কোন গোল থাকিবে না। জন পদোচিত সমস্ত ব্যবহারই আশ্রমে বর্ত্তমান; সুতরাং আশ্রম জন পদ নয় বলিলে চলিবে কেন? অনেক সময়েই মনে হয়—বিষয়ে যোগ থাকিলেই অথবা বিষয়ীর সহিত যোগ থাকিলেই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়া যখন পরিবর্ত্তনের আর পরিবর্ত্তন করা যায় না,—প্রকৃতি এরূপ অবস্থায় আসে, তখন মানুষ বলিয়া থাকে—"আর যা হ'বার হউক"— অর্থাৎ যত্ন চেষ্টার শক্তি অভাব

হইয়া শিথিলতা আসে। আমারও অনেক সময় এই ভাবই আসে। আবার যখন তোমাদিগকে মনে পড়ে, তখন যেন ভাবান্তর আসিয়া কতক সময় প্রকৃতির বিপরীত হাবু ডুবু করি।

হয় বিষয়ীর বা বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করিতে হয়, না হয় গুরু-চিন্তা ত্যাগ করিতে হয়। ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই; এই জন্যই অষ্টাবক্র বলিয়াছেন— "মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত, বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।"

বঙ্গাব্দ—১৯-১১-১৮] (৬৪) [জ

বাবা! মানুষ যখন যে অবস্থায়—যে স্থানে—যেরূপ সংসর্গে—যে কার্য্যে—যেরূপ চিন্তানুধ্যান নিয়া থাকে, তখন তাহার জ্ঞানটা সেই কার্য্য, স্থান-কাল-দেশাদি অনুরূপ থাকে। কোন ব্যক্তি বিস্তীর্ণ মহাসাগরের মধ্যে জাহাজ আরোহণে নানাপ্রকার উপভোগ্য জিনিস সাম্‌নে নিয়া, নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া থাকিলে, অথবা ঐ ব্যক্তি সিংহ, ব্যাঘ্র হিংস্র-জন্তু-পরিপূর্ণ অরণ্য মধ্যে বাস করিলে, তাহার চিন্তা ও অনুধ্যানের বিষয় কি এক হয়? সময় বিশেষে—সেই ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায়

বিস্তীর্ণ জল-শূন্য মাঠের মধ্যে অবস্থান করিলেই বা তাহার অনুধ্যান চিন্তার বিষয় ও অবস্থা কি হয়? ইহা দ্বারা তুমি চিন্তা করিয়া দেখিবা যে, দেশ-কাল ও সংসর্গের মূলে আমাদের ইষ্ট-চিন্তার ইতর-বিশেষ হইবেই হইবে। সুতরাং অবস্থা বিশেষে—ক্রিয়াগত-বৈষম্য-জন্য ব্যাকুল বা অস্থির না হইয়া,ধ্যেয় বিষয়—"নিরন্তর সৎকার সেবিত দৃঢ় ভূমি"—পাতঞ্জলের এই সূত্র মনে রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।

পুনরায় তোমার সঙ্গে আমার কিছুকাল একত্র থাকা আবশ্যক মনে করিতেছি। তোমাকে আবার একটু বিশেষরূপে সাধন সম্বন্ধে উৎসাহিত না করিলে চলিবে না যেন, আমার মনে হইতেছে। সঙ্গটা যেন একটু বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

বঙ্গাব্দ—২১-১১-১৮ (৬৫) [সু

আমার মন পাগ্‌লারে, তুমি হর্‌দমে গুরুজীর নাম লইও।
ওরে লইও নামটি পরম যতনে॥
দমে দমে লইও নাম কামাই নারে দিও।
তুমি ভাটার টানে ভয় না পাইয়া,উজান দিকে যাইও॥

যে যা' বলে বলুক তোমায়, কাণ না তা'তে দিও।
তুমি 'হংস' বৈঠা জুড়ে দিয়ে দিবা-নিশি বাইও॥
ভাল-মন্দ বিচার কর্‌লে বৃদ্ধি হবে বায়ু।
তুমি 'তা'র' দিকে চেয়ে, 'তা'র' কথা কও,
আর কিছু না কইও॥

বৎস! আজ তোমার চিঠিতে—তোমার কি হবে জান না, তোমার পরিবর্ত্তন হবে কি না বুঝ না—ইহাতে আমার প্রাণে একটা প্রশ্ন আসিল। তুমি পরিবর্ত্তনের জন্য এসব কর, না কিসের জন্য? তা' তুমি বুঝ কি না? যদি পরিবর্ত্তনের জন্য কর, তবে 'গুরু-গুরু' করিলে নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন হইবে, এ-বিশ্বাস তোমার ধ্রুব হয় নাই। আর যদি বল যে, গুরু-গুরু করিলে পরিবর্ত্তন হয় বুঝি, কিন্তু আমি গুরু-গুরু করিতে পারি না,এজন্য কি হবে বুঝি না; তাহা হইলেও গুরু কৃপায় সব সম্ভব এ-বিশ্বাস তোমার হয় নাই। যদি বল গুরু কৃপাতে সব সম্ভব, এ-বিশ্বাস তোমার আছে – তাহা হইলে গুরুর তোমার প্রতি অপার কৃপা, তাহাতে সন্দেহ আছে। তবে কোথায় যাই,—কি করি? এখন পর্য্যন্ত তোমার নিজ প্রকৃতিতে হাত না দিয়াই,কেবল তোমাকে নিয়া টানাটানি; তাও ত দেখি সয় না। কারণ বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তির ভালবাসাও

বিষময়। যেহেতু—ক্রিয়াগত-বৈষম্য বর্ত্তমানে, ঐক্য সম্ভবপর নয়।

আমার প্রকৃতিতে যেরূপ ক্রিয়া বর্ত্তমান – সেই ক্রিয়ার অভাব না হইলে অথবা অভাবের ইচ্ছা না হইলে, যাহাকে শাস্ত্রে বৈরাগ্য বলে, তাহা না হইলে—গুরু-গুরু করিতে গেলে গুরু-অনুরূপ গুরু-শব্দ না হইয়া, গুরুতেই গুরুতর জ্বালা দেয়। তজ্জন্যই বিষয়-ভাব বর্ত্তমানে গুরু বলা অসম্ভব বলিয়াই, গুরু শব্দের পরিবর্ত্তে, অর্থাৎ "গুরো গুরুতরংনাস্তি" মহাদেবের এই বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া— চৈতন্যদেব জীবকে "হরি হরি বোল" শিক্ষা দিয়াছিলেন। কলির ব্রাহ্মণগণ দুই ওষ্ঠ সঙ্কোচ করিয়া ওঁ বলাই শ্রেষ্ঠ-সাধন বলিতেছেন! আজ সেই যুগে, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া 'পূর্ণানন্দ' আনন্দ পাইবে—এই প্রত্যাশায় জাল পাতিয়াছে।—

জালে বদ্ধ হবি কে আয় আয়,
জালে বদ্ধ হ'লে, কোন কালে ফিরিবি না এ-ধরায়।
এ-জালের এ-দিক্ ওদিক্ নাই,
ভাল-মন্দ বিচার থাক্‌লে এসোনা কেহ ভাই।
এ-জালে পড়েছিল 'মার্কণ্ডেয়'
আর 'পঞ্চানন' গোসাই॥

আমি আমার স্বধর্ম্মাক্রান্ত; আমার স্বধর্ম্ম গুরু-গুরু

করা নয়; সুতরাং আমার ধর্ম্মের বিপরীত আমি কিছু করিতে পারি না—করার ধর্ম্মই তা' নয়। যেখানে করা আছে—সেইখানেই আমার অনুরূপ করা আছে। আমার করার বাহিরে কি আমার থাকা সম্ভবপর? যখন আমার বাহিরে আমি আছি, তখন আমার বাহিরে আমার করাও আছে। আমার বাহিরে আমি আদর্শ ভিন্ন থাকিতে পারি না। জগতের সমস্ত, আমি বাদ দিলে,—জগদনুরূপ আমি কোথায় থাকি? যতক্ষণ জগদনুরূপ আমি আছি, ততক্ষণ আমার জ্ঞানে জগৎও আছে! এ-সংসারে জগদতীত আমি 'গুরু'—সেই 'গুরু' আদর্শ না হইলে 'আমি' অতিক্রম করিয়া আমার অতীত 'আমিতে' যাইতে পারিব না।

আদর্শই জীবের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের কারণ। 'পূর্ণানন্দ' তোমার জীবনের আদর্শ; তোমাতে নিরানন্দ কিরূপে সম্ভবে? এ-কথায়ও সন্দেহ? এ-কথায়ও আশঙ্কা? বৎস! তুমি তোমার 'পূর্ণকে' চিন নাই; 'পূর্ণ' তোমার কোলে থাকিতেও তুমি দেখ না। দিবসের ২৪ ঘণ্টা তুমি 'পূর্ণের' প্রাণে বিরাজ করিয়াও তোমার অনুভব হয় না। তবে আর আমি কি করি? তোমাকে জানিতে দেই না—কেন জানিতে দেই না? তুমি অনায়াসে জানিতে পারিলে, এ-যে কত কষ্টের, কত

যত্নের ও কত আরাধনা বা তপস্যার ধন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিবে না—এ অনির্ব্বচনীয় তুলনা-রহিত পদার্থ অনায়াসে পাইলে, তাহার মূল্য কিছুই অনুভব করিবে না। দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চমুখে যে ধনের গুণ বর্ণনা করিতে অক্ষম হইয়াছেন—বলিতে গিয়া চতুর্ম্মুখ একেবারেই মূক হইয়াছেন—অন্ত না পাইয়া নারায়ণ অনন্ত-শয্যায় শায়ী হইয়াছিলেন—যে মার্কণ্ডেয়ের জীবনের সহিত অভেদাত্মক সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই মার্কেণ্ডেয়ও ইহার গুণ বলিতে অক্ষম। আমিও বাবা,—'সাপুনঃ' করিলে কিছু কিছু বুঝিতাম, তাও তোমারে স্থান দিয়া—হৃদয়-স্থানটা বদ্ধ করায়, আর প্রাণে বসাইয়া বুঝি না, দূরে দূরে রাখিয়া বুঝি। 'তাঁ'রে' আনিয়া জায়গা দিলে, তুমি জায়গা পাও না; সুতরাং 'তাঁ'রে' জায়গা দিতে পারি না। শিষ্য এই জ্ঞান নিয়া 'তাঁহাকে' কতটুকু বুঝা যায়? যতটুকু বুঝা যায়, ততটুকু তোমাকে বুঝাই—তাই তুমি অতটুকু বুঝ নাই যে, 'তাঁ'র' দয়ায় সকলই সম্ভব—'তাঁহার' অপার করুণা আমার প্রতি। 'তাঁহার' অপার করুণা অনুভব করিলে ত সদাই গাহিতে:—

তোমার অপার করুণা,—করুণা-সিন্ধু হে!
আমি ভাবে ডুবে ভব-মাঝে, বুঝি না তোমায় মোহে॥

'পঞ্চানন' বিধি আদি, করতে নারে যা'র অবধি,
'তাঁ'রে'—বুঝে বুঝা, মহাব্যাধি ঢুকেছে আমার হৃদে ॥
কি করিতে কি করতেছি, কি ভাবতে কি ভেবে আছি।
কিসে মরি, কিসে বাঁচি, 'কেচা-মিচি' সদা গৃহে ॥
'বসনেরি' শেষ নিবেদন,—অন্তে যেন সব ভুলে মন।
রয়না যেন দেহের কারণ, এ-মিনতি চরণে ॥

বৎস! ব্যাকুলতা আসিলে কতই না আতঙ্ক আসে। পুরাণ,—দ্বাপরে কৃষ্ণাবতারে, যশোদার ব্যাকুলতার প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই বা গোপালকে হারাই, যশোদার এই আশঙ্কা সর্ব্বদা অন্তরে বর্ত্তমান ছিল। তোমার কি প্রাণের ব্যাকুলতায় এই ভাব আসিয়াছে, যে—তোমায় বুঝি ভুলিয়া গেলাম, ভুলিয়া গেলাম? ২৪ ঘণ্টা ভুলিয়া গেলাম বলিয়া যে জিনিসের জন্য আশঙ্কা করা যায়, কেহ কি সেই জিনিস ভুলিতে পারে? তোমার ভয়ের কারণ কিছু নাই; তুমি স্থির হইয়া তোমাকে যা' করতে বলেছি তা'ই কর। বেশী বুঝিলেই গোলমাল, তাই অনেক সময়েই গাই :—

তুমি আমায় এবার কর পার,
আমি অধম দুরাচার, ভজন জানি না তোমার ॥
গুরু তোমার নামের বলে, সলিলেও ভাসে শিলে
সেই বলে দিয়েছি সাঁতার।

আমি যদি ডুবে মরি,—কলঙ্ক তোমার ॥

এই বিশ্বাস নিয়া থাকাই ভাল। অত কথায় কাজ কি? অনেক কথা কইতে গেলে, তা'র মধ্যে দোষ-গুণও আসে। একটাই বিচার-রহিত অবস্থা; অনেক হইলেই তাহার মধ্যে অনেক বিচার আসে। বিচার আচারেই যত গোলমাল, যত অনিষ্টের মূল। আমিও অনেক নিয়াই গোলে পড়িয়াছি। কেবল 'তুমি আর আমি' হইলে একটু বেশী সুখ হইত না কি? এ-কথাটা তুমি কেমন বুঝ? না, তুমি স্বার্থপর না; বহু আত্মীয়-বন্ধুর উপকারের জন্য প্রস্তুত। যদি আত্মীয়-বন্ধুর উপকারের জন্য প্রস্তুত হও, তাহা হইলে আত্মীয়-বন্ধু নিয়া তোমার সহিত আত্মীয়তা করি। এই জন্যই ৮ পৃষ্ঠা চিঠির মধ্যে গুরু-শব্দ তিনবারও করা হয় নাই। বাবা,—'তুমি আর আমি' থাকিলে কেবল গুরু-গুরু করিতাম, গুরু-গুরুই শুনাইতাম, গুরু-গুরু ভাবিতাম, গুরু-গুরু গাইতাম, গুরু বলে নাচিতাম, গুরু বলে বাজাইতাম। আর কি ক'ব? কি করে তোমার সন্তোষ করিব? এত উপাসনা যদি 'তাঁর' করিতাম, তাহা হইলে এত আশঙ্কা—চিন্তা-ভাবনা—জল্পনা-কথা হইত না। এত হয় তবু ছাড়াছাড়ি নাই, তা'তেও তোমার বিশ্বাস নাই। তবে, বাবা,—সব-রেজিষ্ট্রারের আপিসে গিয়া দলিল

রেজেষ্টারী আবশ্যক। ফাঁকিবাজেরা ফাঁকি দিতে চাহিলে রেজেষ্টারীতেও কুলায় না। বৎস! দলিল কি আজও রেজেষ্টারী বাকী আছে? সমস্ত ভারতবাসী এ দলিলের সাক্ষী,—গুরুর নিকট বিক্রীত। তুমি কি এখনও অস্বীকার করিতে চাও?

বঙ্গাব্দ – ২২-১১-১৮] (৬৬) [জ

অনেক সময়েই চিন্তা করিয়া দেখি—সংসারে ভীষণ বিপদ; রুচি বৈচিত্র্যতায় মত ভেদ, সৃষ্টির আদি হইতে চলিতেছে এবং আরও চলিবে। মানুষের মতামত বিচার করিয়া কার্য্য করিতে গেলে—ঠিক্ কি বেঠিক্ করিলাম বুঝা শক্ত। সর্ব্ব অবস্থায়ই দেখিতেছি—কেহই কাহারও নিজের রূপ দেখিতে পায় না। আমি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ দেখি, কিন্তু সর্ব্বাবয়ব দর্শন করিতে পারি না। আমার সর্ব্বাবয়ব দেখি না বলিয়াই আমি নিজে—নিজের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কি না, তাহা আমার বুঝাও আমার বিচারে অসম্ভব। আবার অনুমানে বুঝিতে গেলে, আমার কুৎসিৎ অঙ্গকে সুন্দর বুঝিতে পারি—সুন্দর হইলেও কুৎসিৎ মনে করিতে পারি। পক্ষান্তরে—

অপরের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করাও ভীষণ বিপত্তি, কারণ রুচিগত পার্থক্যে, মানুষের সুন্দর-কুৎসিৎ জ্ঞান বিভিন্ন। ব্যক্তিবিশেষ যে রুচিতে যাহা সুন্দর দেখে, সে তাহাই সুন্দর বলে; সুতরাং আমি আমার রুচিমত সুন্দর না হইলেও, বিপরীত রুচির লোকের মতানুসারে, আমি আমাকে সুন্দর বলিয়া ঠিক্ করিতে পারি। এমতাবস্থায় অপরের সাক্ষ্য দ্বারা আমাকে সুন্দর বলিয়া স্থির বা সিদ্ধান্ত করা ঠিক্ হয় না; এরূপ করিলে গুরুতর ভ্রমে পড়িতে হয়। এমত স্থলে যে ব্যবহার বা যৎপ্রমাণের দ্বারা আমি শান্তি পাই— তাহাই আমার পক্ষে প্রশস্ত; ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত কেবল জ্বালার কারণ। এই জন্যই আর্য্য-ঋষিরা অপরের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর না করিয়া, যে শব্দে বা যদুপায়ে প্রাণে বিন্দুমাত্র অশান্তি না থাকে, তাহাই ঠিক্ ও তদ্বিপরীত বিষয় বা ব্যাপার ভুল অথবা ভুলে সাময়িক ঠিক্ জ্ঞান হয়—এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

বিষয়ীরা বিষয় বুঝে না; কারণ, বিষয় বিষয়ের স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম। অবিষয়ই বিষয়কে দেখে ও বুঝে। তবে অনেক সময়ে বিষয়ের গাঢ় আসক্তিতে [তাহারা] অবিষয়কেও জ্বালাদায়ক মনে করে। বাস্তবিক পক্ষে— কোনও অবস্থায়ই বিষয়, জ্বালা-পরিশূন্য হইতে পারে না।

কিন্তু ভগবৎ-সাধন বা অবিষয়কে যখন বিষয়-পরিশূন্য অবস্থায় ঐকান্তিকতার সহিত অনুধ্যান করা যায়, তখন দেখা যায়—তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভিন্ন অনুমাত্রও নিরানন্দ নাই। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভগবৎ-সাধনই জীবের ঠিক্ আনন্দের কারণ। ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? তবে, যেখানে উভয় কার্য্য যুগপৎ হইতে থাকে, সেখানে একটা তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ সুখ-দুঃখ মিশ্রিত একটা অবস্থা জীবের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। তখন উভয় অবস্থায়ই সংশয় আসে, অর্থাৎ একবার বিষয়কেই আনন্দের বিষয় মনে করে, আবার ভগবৎ-সাধনকেই আনন্দের বিষয় মনে করে—অথবা বিষয়কে দুঃখ—আবার ভগবৎ-সাধনকে দুঃখ মনে করে। সে সময়ে প্রকৃত সত্য নিরুপণ করা জীবের পক্ষে সুকঠিন হয়। তাই বলি—পর্য্যায়ক্রমে একটা পরিত্যাগ করিয়া আর একটা উপভোগ করিলে, জীব বুঝিতে পারে কোন্‌টা ঠিক্, কোন্‌টা বেঠিক্।

ইহাও দেখা যায় যে, বিষয়েতে অভাবের অভাব হওয়া অসম্ভব; সুতরাং অভাব থাকিতে সুখের প্রত্যাশা মরুভূমিতে জল ভ্রমের ন্যায়। যাহা হউক—এবার তোমার সঙ্গে দেখা হইলে যাহা বলিবার আছে বলিব।

বঙ্গাব্দ—২৪-১১-১৮] (৬৭) [স্থ

ক্রমে দিন হইতে দিন অতিবাহিত হইতেছে—জীবন-লীলার অবসান সময় আসিতেছে; আমাকে তোমরা মোহ-জালে বদ্ধ করিয়া আমার চিন্তার-ধন চিন্তামণিকে হৃদয় হইতে তাড়াইতেছ। তবুও তোমরা আত্মীয় ও তোমরা প্রাণের প্রাণ। 'বিশা' বলিলেই দিশাহারা হই, আর কোন চিন্তা থাকে না। তুমি যদি সেই অন্তিম-দিনে গুরু-স্মরণ না করাইয়া তোমাকেই স্মরণ করাও, তোমাতে আমার মন বদ্ধ রাখ এবং তোমার মধ্যে বিষয় দেখি—তবে আমার উপায় কি? * * * তুমি আমাকে পরিষ্কারই লিখিয়া জানাইবে যে, তোমার জন্যও আমার সংসার করিতে হইবে কি না? সংসার করিতে হইলে আমি আর এ অবস্থায় থাকিব না। আমি তোমাকে নিয়া অসংসারী হইয়া থাকিতে পারিব কি না, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য। চতুষ্পার্শ্বে কেবল বিষয়ের কোলাহল। * *

আমি জানি যে, বিষয়ীর চিন্তা অনুধ্যান ও বিষয়ের বিন্দুমাত্র সংস্পর্শ থাকিলেই, অলক্ষিত ভাবে বিষয় প্রবেশ করে; যেহেতু—'আমি'র উৎপত্তি বিষয় হইতে। বিষয়—বিষয় বুঝে না, অর্থাৎ কেহই কাহারও নিজ-স্বরূপ বুঝে

না। আমি আমার পূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিতে পারি না এবং আমি সুন্দর না কুৎসিৎ তাহাও বুঝিতে পারি না। আমার সুন্দর-কুৎসিৎ কেবল অপরের বাক্যের উপর নির্ভর করে। আমার রূপকে যাহারা কুৎসিৎ হইলেও সুন্দর দেখে, তাহাদের সাক্ষ্য দ্বারাও আমার সৌন্দর্য্য বা কুৎসিততার ঠিক প্রমাণ হয় না। এই সব সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা আমাকে আমি সুন্দরই মনে করি; সুতরাং সে-ভ্রম আর কিছুতেই দূর হয় না। জগৎ ভরিয়া বিষয়ীরা বিষয়ের বিষ বুঝে কোথায়? সুতরাং বিষয়ীর সাক্ষ্য দ্বারা আমি এ-সাধুতাকে সাধুতা মনে করি না। বরং দিন দিন বিষয়েই ডুবিয়া যাইতেছি, অথচ বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাদের জ্ঞানে তোমরা গুরু বুঝিতেছ; আমি যে, গরু হইতেও গুরুতর নীচে পড়িয়াছি, তাহা মাঝে মাঝে 'গুরু-গুরু' করিলে অনুভব করিতে পারি। আমার সাক্ষী গুরু ভিন্ন আর কেহ নাই। আমার স্বরূপাবস্থা 'গুরু-গুরু' করিয়া বুঝা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আমি গুরু-গুরু করিলে—যে অবস্থায় আছি, সে অবস্থা ঠিক কি না তাহা গুরুই মাত্র বুঝাইয়া দিতে পারেন। কেন না গুরু-গুরু করিলে আমার এ-অবস্থা আর ভাল লাগে না। সুতরাং এ-অবস্থা ভাল হইলে, গুরু ভাল লাগে না বলেন কেন? তবে গুরু ভাল, না বিষয় ভাল,

এ বিষয়ে আপত্তি আসিতে পারে। কিন্তু কোন্ কথায় আমার জ্বালা হয়—ইহা বিচার করিতে গেলে, গুরু যাহা বলেন তাহাই ঠিক, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে বলিতে পার—বিষয়ে ভীষণ আসক্তির অবস্থায় গুরু-গুরুও ভাল লাগে না। এতদ্বারা বুঝাইতে পার যে, গুরুটা ভাল না; কিন্তু যখন গুরু-গুরু করিতে করিতে ঠিক্ মত 'গুরু-গুরু' আসে, তখন আনন্দ-বই জ্বালা থাকে না। এই উভয়ের তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে—বিষয়ে জ্বালা-শূন্য ভাল-লাগা নাই; অতএব আমার গুরুর সাক্ষ্যই সর্ব্বতোভাবে নিঃসংশয় রূপে সত্য, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি আর প্রতারকের সাক্ষীতে ভুলিব না; যদি ভুলি, তবে আমার দেহ বর্ত্তমানে—জ্বালারও অবসান হইবে না।

বঙ্গাব্দ—২৬-১১-১৮] (৬৮) [সু

সমস্ত জগৎরূপ-গ্রস্থ বিশ্বপাতার বিশ্ব-রাজ্যের সত্য-মিথ্যা ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে। শিষ্যের প্রশ্নমতে প্রকৃতি ও বুঝের ঠিক-বেঠিক বুঝাইতে গিয়া, মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই বলিয়াছেন ঃ—

জগতের যত প্রাণী আছে, সকলেরই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ বুঝ্, এবং সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ বুঝে, ঠিক-বেঠিক ও ভাল-মন্দ বুঝে। অর্থাৎ মানুষ, গরু, ভেড়া, ছাগল, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির প্রকৃতি ও বুঝা-বুঝি স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ ; যথা ঃ—কুকুর বিষ্ঠা ভক্ষণে সন্তুষ্ট ও কুকুরানুরূপ ব্যবহার করে ; গরু, ছাগল ইত্যাদিও সেইরূপ। জলচর, ভূচর, খেচর অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ সকলেই সকলের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ আহার-ব্যবহার, বাস স্থান, স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ, সন্তান প্রসব ইত্যাদি করিয়া থাকে। কেহই কাহারও নিজ নিজ প্রকৃতি অনুরূপ কার্য্যকে ভুল মনে করে না। আবার এক প্রকার প্রাণী অপর প্রকার প্রাণীর অবস্থা বা কার্য্যকে ভুল মনে করে ; এবং ইহাও দেখা যায়—কেহই নিজের প্রকৃতি কি বুঝ্ পরিত্যাগ করিয়া অপরের প্রকৃতি বা বুঝ্‌কে ভাল মনে করে না ও ভাল মনে করিয়া অপরের প্রকৃতি গ্রহণ করে না। এতদ্বারা প্রকৃতি ও বুঝা ঠিক কি না, এ সিদ্ধান্তে এই বলিতে হইবে যে, হয় সকলের প্রকৃতিই ঠিক, না হয় এক জনের ঠিক, অপরের ভুল, অথবা কাহারও প্রকৃতি বা বুঝা ঠিক নয়। যদি সকলের বুঝা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভাল-মন্দ এ-বিচার ভুল। আবার যদি এক জনের ঠিক হয়, আর সকলের

ভুল হয়, তাহা হইলে ঐ এক জনের প্রকৃতি এক ভাবেই স্থির থাকা স্বাভাবিক এবং অপরের ঐ প্রকৃতিতে কোন সংশয় করিবার কারণ থাকে না।

দেখা যায়—যাহারই প্রকৃতি ঠিক বলিয়া আমরা ঠিক করি না কেন, তাহারই প্রকৃতি বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য অবস্থা চতুষ্টয়ে ভেদ হইয়া যায়। এমন কি, কার্য্য বিশেষে বা অবস্থা বিশেষে, প্রতিনিয়তই যাবতীয় প্রাণীর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতি ও প্রকৃতি অনুরূপ বুঝা একটা ঠিক পদার্থ নয়। এমতাবস্থায় ঠিক একটা আছে ইহা স্বীকার করিতে হইলেই বলিতে হয়—প্রকৃতির অতীত একটা জিনিস ঠিক। অতএব প্রকৃতির অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঠিক বুঝা অসম্ভব এবং বুঝার চেষ্টা করাও ভুল।

কোন্ অবস্থায় আমরা প্রকৃতির অতীত হইতে পারি, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। দেখা যায়—প্রকৃতির কার্য্য কেবল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ যোগেই হইতেছে; তবেই বলিতে হইবে বা বুঝা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের অতীত অবস্থায় না যাওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতি বর্ত্তমান ও প্রকৃতি অনুরূপ বুঝা-বুঝিও বর্ত্তমান। প্রকৃতির অনন্ত প্রকার ভেদে অনন্ত প্রকার বুঝিব এবং বিভিন্ন সময়ে অনন্ত প্রকারই ঠিক ধারণা

হইবে। প্রকৃতির স্বাভাবিক শক্তি এই যে,—যখন যে অবস্থা আমাতে প্রকাশ, তখন সেই অবস্থাই আমাকে ঠিক বুঝায়; এই হেতুতেই—জীব তাহার ভ্রান্তিকেও ভ্রান্তি বলিয়া বুঝে না। এই সব ভ্রান্তির মহৌষধ 'গুরু'; যাহা বুঝিলে প্রকৃতির অপর বুঝ অভাব হয়। আবার অন্য পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়—যাহা সর্ব্বাবস্থায়ই এক ভাবে থাকে, যাহার কোন অবস্থায়ই পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাই ঠিক, তাহাই প্রকৃতির অতীত অবস্থা। তাহার একমাত্র উপায় 'গুরু'—যাহার কোন অবস্থায় পরিবর্ত্তন হয় না যাহাতে সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থাই অবর্ত্তমান—যাহাতে অভাবের অভাব করে, বৃদ্ধি করে না—যাহা সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন হয় না, তাহার নামই 'গুরু'। তবে প্রকৃতির বুঝ অনুসারে গুরু বলিলে বা গুরু বুঝিলে তাহাতেও জ্বালা ঘটে। সে 'গুরুর' স্বরূপাবস্থা নয়, সে প্রকৃত গুরু বলা হয় নাই; সে প্রকৃতি বলে গুরু বলিতেছি, প্রকৃতি অনুরূপ গুরু বুঝিতেছি। প্রকৃতিতেও লঘু-গুরু বর্ত্তমান। এই হেতুতেই মানব অপর প্রাণী অপেক্ষা নিজকে গুরু বা শ্রেষ্ঠ মনে করে। যে বুঝা-বুঝিতে রাত-দিন আমার জ্বালা ভোগ করিতে হইতেছে, যে-বুঝায় এক ভাবে স্থির থাকিতে

প্যারি না, সেই বুঝ প্রকৃতির ; গুরু বলিয়া মনে করিলে প্রকৃতির অনুরূপ গুরু, অথবা ভুল। আমি তোমাকে কি বুঝাইব ? বুঝাইতে গেলেই প্রকৃতির বুঝে বুঝাই ; তাই তুমি বুঝিতে গিয়াও প্রকৃতির অনুরূপ বুঝ। আমি যখন গুরুর মত বুঝাইব, তখন তোমার অন্য রকম বুঝা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এক রকম বুঝে আর এক রকম বুঝাইতে গেলেই, সে বুঝে বোঝা ভারী হয়। প্রকৃতি বাদ দিয়া গুরু-বাক্য বুঝিয়া থাকিলে এত বুঝা-বুঝির কিছু দরকার করে না।

আমার প্রাণ যে, প্রকৃতির মূর্ত্তি 'বিশু' আটকাইয়া রাখিয়া 'গুরু' বুঝিতে চায়, এমন না-বুঝের সঙ্গে পড়িয়া উপায় করি কি ? তুমি আমার মন থেকে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া দেখ দেখি, আমি তোমায় কি বুঝাই—আমি কি বলি—আমি কি করি—আমি কোথায় থাকি—আমি কা'র এবং তখন কে আমার ? বৎস ! প্রাণটা জুড়িয়া তুমি থাকিবে—অথচ গুরু বুঝিবে ! এমন বে-বুঝ নিয়া কোথায় যাই ?

কেবল তুমি নও,—তোমার সকল নিয়া আমার প্রাণের ভিতর বাস কর। যেখানে বহু—সেখানে প্রকৃতি। যেখানে কেবল 'গুরু'—সেখানে আর কেহ নাই ; কেবল 'তুমি আর আমি' অথবা 'আমি আর তুমি'। বাবা,—

আর পারিব না। বুঝা ভুল বুঝিয়াও, প্রকৃতির দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি পড়ায়, এ-বুঝা-বুঝিতে আবার বদ্ধ হইলাম। সেই বুঝা-বুঝির অতীত—প্রকৃতির সংস্পর্শের লেশ মাত্র যেখানে নাই, সেই 'গুরু'কে ভুলিয়া কেবল প্রকৃতি নিয়াই আছি। প্রকৃতির গান গাই- প্রকৃতির কথা কই—প্রকৃতি অনুরূপ চলি—প্রকৃতি অনুরূপ বুঝি ও বুঝাই; সুতরাং প্রকৃতির অতীত অবস্থা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? তুমি আমায় ছেড়ে দাও, আমি একবার প্রাণ-ভরে 'গুরু-গুরু' বলি—তুমি আমা হইতে তফাৎ থাকিয়া—সেই মধুর ধ্বনি শুন।

আমি প্রাণের সঙ্গে বুঝিয়াছি—যখন কেবল 'গুরুই' ভাবিয়াছি, তখন ত এত বুঝি নাই, এত বুঝাই নাই। মা কেবল 'গুরু-গুরু' শুনিয়া গিয়াছে,—সে অন্য কিছু বুঝিতে চায় নাই, আমিও বুঝাই নাই। তা'র অন্য জ্ঞানও ছিল না, তাই—"গুরু-ধন তোরে আর কি লাগুর (নাগাল) পাব"—এই গাইত।

প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি সমস্ত আমাতে—অথচ তোমাকে গুরু বুঝাইতেছি এবং সেই গুরু—কি বুঝাই. তাহা শুনিবার জন্য আমার ডা'নে বামে কেহ কেহ বসিয়া আছে। এ-গুরু বুঝান তুমি কেমন বুঝিলা, তা'রাই বা কেমন বুঝিল, আমিই বা কেমন বুঝাইলাম? 'গুরু' বুঝিলে প্রকৃতি

থাকে ন—অথচ প্রকৃতির সকল আমাতে বর্ত্তমান, এ-কেমন গুরু বুঝান ? আমি বুঝিলাম,—প্রকৃতির অনুরূপ যে একটা গুরু আছে—তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। তোমরা ঐ প্রকৃতির অনুরূপ গুরু বুঝিতেছ ; সুতরাং কই গুরু—কই গুরু—এ-তালাস আর অনন্ত কালেও শেষ হইবে না।

তাই বলি—বৎস ! তুমি 'গুরু-গুরু' বলিয়া প্রকৃতির অপর পারে গিয়া দেখ—গুরু কি মধুর ; কোন তর্ক, মীমাংসা, জ্বালা, বুঝ্ কিছু থাকিবে না। বুঝিয়া যে 'গুরু' বুঝা, সে কেবল গুরু বোঝা মাত্র। তবে তোমার প্রকৃতিতে বুঝ্ আছে—আমিও বুঝাই, তুমিও বুঝ ; বুঝিতে বুঝিতে যখন বুঝা যায় না বুঝিবে, তখনই বুঝিবে বুঝের অতীত না হইলে বুঝা যায় না। বুঝা যায় থাকিতে বুঝ্ কিছুতেই থামিবে না। বুঝা যায়, না গেলে আর বুঝ্ আসিবে না ; সুতরাং আর বুঝিয়া দরকার নাই ; অথবা 'গুরু' বুঝিতে সতত চেষ্টা করিলে বুঝিবে—বুঝা যায় না। ইহা ভিন্ন আর ঔষধ নাই।

না বুঝ্ হইয়া থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই তোমাকে সর্ব্বদা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি—বুঝিয়া যাহাতে বুঝ যে,—বুঝা যায় না। সেই 'বুঝা যায় না'র মধ্যে যদি অন্য বুঝ্ অর্থাৎ গুরু ভিন্ন অন্য বুঝ্ বর্ত্তমান-

থাকে, তাহা হইলে এই বিপত্তি ঘটে জীবের—যে যা' বুঝি তাই ভাল, গুরু বুঝিয়া দরকার নাই। আর যদি অন্য বুঝ্ না থাকে, তাহা হইলে বুঝা যায় না বুঝিয়া, যা' বুঝি তাতেই বুঝার শেষ হয়। এবার দেখা হইলে ভাল করিয়া বুঝাইব যে, বুঝ্‌টা কত গুরুতর বোঝা; ইহা ভিন্ন আর বুঝার কিছু নাই। তবে যে বুঝ্ আছে, সে-বুঝ্ এই বুঝে কিছুতেই বুঝিবে না;* সে জন্য বৃথা পণ্ডশ্রম করিতে আমি আর রাজী নই।

বঙ্গাব্দ—১-১২-১৮] (৬৯) [সু

গত কল্য তোমার এক পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। লিখিয়াছ যে—"তোমার প্রাণের প্রাণ কেমন এবং তোমার প্রাণের প্রাণে বিষয় থাকিলে আশা কি?"

জগতের সমস্ত বস্তুই আমার প্রাণের প্রাণ; আমার

* এই প্রসঙ্গে—ঠাকুরের জ্ঞানী শিষ্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী (ঠাকুর পূর্ণানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত জগৎপুর ও কালীপুর আশ্রমদ্বয়ের বর্ত্তমান গুরু—পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভূমানন্দ স্বামী) কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঠাকুরের উপদেশ—"**বিষয় ও বিষয়ীর সংসর্গে বিকারপ্রাপ্ত পূর্ণানন্দের প্রলাপ-বাক্য**" পুস্তক পাঠ করিবেন।

প্রাণের প্রাণ বাদ দিয়া জগতে কোন পদার্থই নাই, থাকা সম্ভবও নয় ; যেহেতু—'হুঁ' না হইয়া কোন পদার্থই সৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। যে স্থলে—আমি প্রাণের প্রাণ বুঝি,—ইহা বুঝ, সে স্থলে—প্রাণের প্রাণে বিষয় থাকে না। আমি যে প্রাণের প্রাণ বুঝি—এইটুকু বুঝিলে, বিষয় বুঝিবে কেন? 'আমি' বিষয়ের অতীত—আমাকে বুঝিলেই বিষয় ভুল হয় ; এ জন্যই লিখিয়াছিলাম—আমি যে প্রাণের প্রাণ বুঝি, তাহা তুমি বুঝ কি না? আমি প্রাণের প্রাণ মনে করিলে কি হইবে, যদি সে প্রাণের প্রাণ না বুঝে।

কোন ব্যক্তিকে তাহার অলক্ষিত ভাবে প্রাণের সহিত ভালবাসিলে, সে যদি সেই ভালবাসা না বুঝিয়া শত্রু মনে করে, তবে সেই ভালবাসায় তাহার কি ফল আসে? সেই ভালবাসায় তাহার কোনও উপকার সম্ভব কি না, ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবে।

বালক তাহার প্রকৃতি অনুরূপ ব্যবহার পাইলেই ভালবাসা মনে করে ; সেটা কি তাহার প্রতি স্বরূপ ভালবাসা? রুগ্ন ব্যক্তি কু-পথ্য পাইলেই ভালবাসা মনে করে এবং সেই কু-পথ্যের ফলে অকাল-মৃত্যু ঘটে—সেই কু-পথ্য-দান কি প্রকৃত ভালবাসা? শিশুকে জ্ঞান দেওয়ার জন্য যে তাড়না করা হয় বা তাহার মঙ্গল কার্য্যের জন্য যে তাড়না করা হয়, সে ত তাহা শত্রুবৎ ব্যবহার মনে

করে; তাই বলিয়া কি, সে স্থলে প্রকৃত ভালবাসার অভাব?

আমার কেমন ভালবাসা জানিতে চাহিয়াছ। আমার ভালবাসায় কাহাকেও বিষয়-গরল পান করিতে দিতে চায় না। আমার ভালবাসা এই; ইহা তুমি ভালবাস কি না এই আমার জিজ্ঞাস্য ছিল। তুমি ত মোহ-বশে অনেক সময়ে বিষকে অমৃত মনে কর। তবে, অনেক সময়ে রোগ বিশেষে বিষও অমৃতের কায করে, এইজন্য বলি এম্, এ, পড় ও মাকে ভালবাস। এখানে বিষ আবশ্যক।

যদি তুমি বুঝ যে, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তবে ইহাতে কোনও আপত্তি বা দ্বিরুক্তি হইবে না। যাহা-হউক আমার বুঝানুরূপ যাহা বুঝিব, তাহাতেই আমার বুঝ থাকিবে এবং আমার মত আমি থাকিব, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার যত পরিবর্ত্তন সমস্তই অপরের বুঝানুরূপ বুঝিয়া। সংসারের যত জ্ঞান সমস্তই আদর্শানুরূপ বুঝিয়া বুঝি; পক্ষান্তরে—আদর্শানুরূপ হই-ও। কিন্তু যখন যেরূপ হই তখন সেইরূপই বুঝি; এই জন্যই রূপ পরিবর্ত্তনেও পরিবর্ত্তন বুঝি না।

তোমাকে এই জন্যই বারবার সতর্ক করা হইতেছে যে, তুমি 'আমার' মত হইয়া আমাকে বুঝ; অন্য রকম

বুঝ রাখিয়া আমাকে বুঝিলে আমাকে বুঝিবে না, নিশ্চয়ই অন্য রকম বুঝিবে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তখনই আমি তোমা হইতে অন্য রকম থাকিব; 'তুমি-আমি' কিছুতেই এক হইবে না। যেখানেই আমার পরিবর্ত্তন হইয়া আমি অন্য রকম হই, সেইখানেই 'সে আর আমি' এক, তদ্ভিন্ন এক হওয়া অসম্ভব।

এই বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে 'আমার' অনন্তরূপ প্রকাশ; সুতরাং 'সা পুনঃ' যোগে সব ফুরাইয়া গেল এ আশঙ্কা তোমার বৃথা। আমি কত রূপে—কত অবস্থায়—কত রকমে—সুখ-দুঃখ বোধ করি, তাহা বুঝাইতে বুঝ্ দিয়া বুঝিলে বুঝের শেষ হইবে না। কেবল এক 'গুরু' বুঝিলেই শেষ হইবে, বুঝা-বুঝি থাকিবে না, বোধ্য-বস্তুর অভাব হইবে।

এই বুঝ্ নিয়াই এক বৎসর মারামারি করিতেছি; যত-ইতি অনিষ্টের মূল বুঝা। বুঝিলেই—'আমি' আর বোধ্য-বস্তু থাকে—অনন্ত জন্মেও আমিত্বের শেষ হইবে না। আমিত্বের প্রকার ভেদ হইতে পারে এবং এক এক প্রকারে, এক এক রকম বুঝিব এই মাত্র। আবার যখন যে রকম বুঝিব তাহাতেই ঠিক বুঝিব, ইহাও সন্দেহ নাই। এই জন্যই সর্ব্ব প্রাণী স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে ঠিক বুঝে।

এ-দ্বন্দ্ব আর কিছুতেই ঘুচিবার নয়, ঘুচিবেও না। ইহা অনন্ত কাল হইতেই ঘটিয়া আসিতেছে ও ঘটিবে।

লিখিয়াছ—বহুকাল বিষয়ানুরূপ অনুধ্যান করিয়া, বিষয় পরিত্যাগ করা একেবারে অসম্ভব। এই জন্যই পতঞ্জলি মুনি "দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্য-সৎকার সেবিত দৃঢ়ভূমিঃ" এই সূত্র করিয়াছেন। এ কেবল ভগবৎ সাধন পক্ষে খাটে—অন্য পক্ষে খাটে না, এ তোমাদের ভুল। আমাদের অনুধ্যানের বিষয় যাহা থাকিবে তাহাতেই এই সূত্র খাটিবে। যাহা হউক সন্তুষ্ট হইলাম যে, তোমার প্রাণে আতঙ্ক আছে যে, আমি গুরু ভুলিলে বা গুরু-জ্ঞান-বিহীন হইলে—সংসারে আর বর্ত্তমান যুগে গুরুর গুরুত্ব একেবারেই থাকিবে না। এটা বুঝা সর্ব্বতোপক্ষে কর্ত্তব্য এবং মনে রাখাও উচিত যে—গুরুও ইহাই বুঝিবেন যে, এ-যুগে গুরু-জ্ঞান অসম্ভব। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

তুমি যখন যে কাযে থাক, তাহাতে অন্য চিন্তা ভুলিয়া যাওয়া উচিত। নচেৎ সমাধি কি একতানতা লাভ অসম্ভব। কলেজে গিয়া আমাকে ভুলিয়া যাও সে জন্য আমি অসন্তুষ্ট নই—সন্তুষ্ট। আমি সর্ব্বাবস্থায়ই বর্ত্তমান। যে যেরূপ অবস্থার চিন্তা করে, তদনুরূপ ফল পায় এবং তদবস্থানুরূপই সুখ-দুঃখ লাভ করে। এ জন্য সব

অবস্থায়ই অনন্তত্ব বর্ত্তমান। 'গুরু'-অসীম অনন্ত পদার্থ; সুতরাং তাঁহাকে যেরূপে চিন্তা করি—সেইরূপে তাঁহাকেই চিন্তা করি বলিয়া, সেইরূপেই অনন্ত অসীম বুঝি।

বঙ্গাব্দ—২-১২-১৮ (৭০) [সু

তুমি যেমন আমার কোলে থাকিতে চাও—আমার তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক প্রবল বাসনা—তুমি সময় পাইলেই আমার কোলে আইস; ইহাতেও যদি বুঝা কঠিন হয়—তবে আয়রে বাবা—কোলে আয়। বর্ত্তমান ভারতে বর্ত্তমান সময়ে কেহ ত আমার জন্য পাগল নহে। যে এ-কোলের জন্য অথবা কোলে রাখার জন্য অনায়াসে সন্তান বিসর্জ্জন দিয়াছিল—সে আজ ৯ বৎসর চলিয়া গিয়াছে—এখন যদি আমার কোলে কেহ থাকে বা আমায় কোলে করিতে চায়, তবে মনে-প্রাণে এক হইয়া বলি—আয়রে বাবা—কোলে আয়।

দূর হইতেই লোকে বড়ই ভয়ের ও জ্বালার বিষয় মনে করিয়া, কেহই 'গুরুর' কোল চায় না; এই জন্যই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করি—আয়রে বাবা—কোলে আয়।

ভীষণ বিষয় দাবাগ্নিতে জীব জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তাই বলি—আয়রে বাবা—কোলে আয়।

* * জীব সর্ব্ব-সন্তাপহারী স্বার্থ-পরিশূন্য অমিয় ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়া, স্বার্থপর ধূর্ত্তের প্রতারণায় কত যে লাঞ্ছনা পাইতেছে—জীবের বিষয়-জ্বালা প্রত্যক্ষ করিলেই চীৎকার করিয়া প্রাণ বলিতে থাকে - আয়রে বাবা—কোলে আয়।

গুরুর নিকট যাইতে ইচ্ছা হইলে দিন, ক্ষণ, সময়, লগ্ন, কোন বিধি বিধির বিধানে নাই। যখন ইচ্ছা তখনই যাওয়ার জন্য বিধি রহিয়াছে—এ জন্য বিধি খুঁজিলেই ভ্রম। গুরুকে পাইবার ইচ্ছা প্রবল হইলে, গুরুর অনুমতি অপেক্ষা করা ভ্রান্তি বই আর কিছু না।

বঙ্গাব্দ—৫-১২-১৮] (৭১) [স্থ

প্রতিনিয়তই সংসর্গ, অবস্থা ও শারীরিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত পরিবর্ত্তন হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যেরূপ ক্রিয়া আমাদের ভিতরে যখন যেহেতুতে জন্মে, তখন তদনুরূপই ধারণা, বুদ্ধি, বিচার এবং ভাল-

মন্দ। অবস্থার পরিবর্ত্তনে সকলেরই পরিবর্ত্তন ঘটে, কেবল এক অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা গুরুর ভিন্ন, অহং জ্ঞানে সম্ভবপর নয়। যেহেতু অহং জ্ঞানটা একটা ক্রিয়া বা motion এর ফল। সুতরাং motion এর সংযোগ-বিয়োগে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল এবং ঐ motion অনুরূপই ঠিক্-বেঠিক্ ধারণা হয়। এজন্যই মানবের সব অবস্থায় এক রূপ ধারণা থাকে না।

তবে আহার, নিদ্রা ও মল-মূত্র ত্যাগ স্বাভাবিক দেখা যায়। অবস্থা বিশেষে এগুলিরও পরিবর্ত্তন ঘটে। সর্ব্বদা এক প্রকার আহারে রুচি থাকে না; মল-মূত্র ত্যাগেও অবস্থা বিশেষে পরিবর্ত্তন হইয়া ব্যাধি বলিয়া উপাধি গ্রহণ করে। নিদ্রাও ঠিক এক রূপ-ভাবে সর্ব্বদা সম্ভব নয়, যথা ঃ—স্বপ্ন ইত্যাদি অবস্থা। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে পরিবর্ত্তন অনুভবের জন্য 'গুরুই' ধ্রুব নক্ষত্র। বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রে দিগ্-দর্শন-যন্ত্র ও ধ্রুব নক্ষত্র, এই দুইটিই মাত্র নাবিকদিগের অবলম্বন। এ-বিষয়-মহাসমুদ্রেও 'গুরু-বীজ' ও 'গুরু' এক মাত্র জীবের অবলম্বন। আমি কোনও অবস্থায়ও নিজের প্রকৃতি দ্বারা, নিজের প্রকৃতির ভাল-মন্দ বিচার করিতে পারি না; যেহেতু আমার বিচারও আমার প্রকৃতি অনুরূপ। আমি যখন মোহ বা

মায়া বশে কোন বস্তুতে আকৃষ্ট হই, তখন তাহার দোষ-গুণ আমার জ্ঞানে অধিকার করে না। তখন আমার বিচারে—আমার আকৃষ্ট পদার্থের সমস্ত কার্য্যই ভাল দেখি ও ভাল বুঝি।

বঙ্গাব্দ—৮-১২-১৮] (৭২) [জ

আমি এবার তোমার সহিত কয়েক দিন একত্র থাকিয়া, যেন একটু বেশী মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। তোমরা আমাকে ভ্রমে মোহ-মুক্ত মনে কর। আমি ঘোর মোহ-মুগ্ধ, নইলে তোমাদের চিঠি দুই দিন না পাইলে বিষয়ীদের অপেক্ষাও বেশী ব্যস্ত থাকি কেন? তবে গুরু সর্ব্বদাই অভ্রান্ত; মানুষ যত সময় পর্য্যন্ত, তত সময় পর্য্যন্ত মানুষ হুঁস্-বেহুঁস্ দুইই থাকে। গুরু চিন্তা না করিলে, বাক্য-ভাষা দ্বারা অভ্রান্ত বুঝা—ঐ বাক্য-ভাষানুরূপ অভ্রান্তই বুঝা হয়। হিন্দুদের গুরুকে হিন্দুরা গুরু বই অন্য উপাধি দেন নাই। গুরু, শিষ্যের সহিত যোগ হইলেই, গুরুর ভ্রান্তি জন্মে। পরমাত্মা দ্বিতীয় বোধ করিয়া, সর্ব্বদাই বদ্ধ ও মুক্ত এই উভয় অবস্থার চিন্তা করিয়া থাকেন। গুরু রূপে যখন শিষ্য বুঝেন—তখনই

সময়ের জন্য ক্ষণিক ভ্রান্তি আসে; আবার অভ্রান্ত পুরুষের সঙ্গে এক হইয়া অভ্রান্ত হন। তুমি কোন্ গুরুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ,—গুরু অভ্রান্ত কি না? যদি মানুষ গুরুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহাতে নিশ্চয়ই ভ্রান্তি আছে। মানুষ কেবল দেহের দ্বারাই পরিচিত; যখন মানুষ দেহ-বোধ-পরিশূন্য হয়, তখন কি কেহ মানুষকে মানুষ বলিয়া থাকে? তখন মানুষকে মানুষ বলাই ভ্রান্তি। কারণ, দেহাভিমান পরিশূন্যতা—আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুতে হয় না। দেহাভিমানই ভেদ-জ্ঞান, সুখ-দুঃখ ও বন্ধনের কারণ হয়। ...কে বলিবা গুরুর চিন্তা করিয়া দেখিলেই গুরু ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত বুঝিবে। 'গুরু' সব কার্য্য-কারণ; আমার করা-করি বুদ্ধিতে 'তাঁহার' করাকেও করা বুঝি। তিনি যে সব করেন,অথচ কিছুতেই তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমানী নন,একথা না বুঝা পর্য্যন্ত, গুরুকে ভ্রান্ত মনে হইবেই হইবে। আমরা কখনও শোকের কারণ অভাবে কাঁদি না; সুতরাং আমাদের এ-বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে বুঝিতে গেলে, তাঁহাকে শোক-মোহের বহির্ভূত মনে করা অসম্ভব। যাহার প্রাণ প্রেমে গলিয়া না কাঁদিয়াছে, সে, কাঁদিবার যে দুইটা কারণ আছে তাহা কিছুতেই বুঝিবে না।

যে বস্তুরই সঙ্গ না করি, তাহাই বুঝি না; সুতরাং

বুঝাইবার উপযুক্ত চেষ্টা সঙ্গ। গুরু মানুষাকারে দেখিলেও দেখিবে—না-চাওয়া চান, না-বুঝা বুঝেন, না-বুঝা বুঝান; সুতরাং বুঝা-বুদ্ধি দিয়া বুঝা এবং চাওয়া বুদ্ধি দিয়া চাওয়া সর্ব্বদাই ভুল হইবে। ক্রিয়া আছে, ফলাকাঙ্খা নাই—ইহা যেমন আমাদের জ্ঞানে অসম্ভব, গুরুও আমাদের জ্ঞানে তেমনি অভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব; পক্ষান্তরে,—আমাদের ভ্রান্ত বুদ্ধি নিয়া অভ্রান্ত ধারণাও ভুল—এ-অবস্থায় অভ্রান্ত একটা শব্দ মাত্র। বিশেষ—যে যাহাকে যেরূপ চক্ষে দেখে, সে তাহাকে সেইরূপ বুঝে। আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাহিরে আমাদের বুঝ কোথায়? ইন্দ্রিয়-জ্ঞান সর্ব্বৈব ভ্রান্তি; সুতরাং অভ্রান্ত বুঝটা আমাদের ভ্রান্তি। প্রাণ বলিতেছে বাবা, তোমাকে দেখি; অভ্রান্ত ব্যক্তির ত অদৃশ্য কিছুই নাই; যখন দেখি না—দেখিবার ইচ্ছা, তখনই ত ভ্রান্তি। যখন বুঝাই তখনও ভ্রান্তি। বোধ্য কিছু ত নাই; বুঝও নাই; বুঝাইতে গেলেই ভ্রান্তি, ইহাতে সংশয় আর কি আছে? যখন গুরুর স্বরূপাবস্থা তখন বুঝও নাই, বুঝানও নাই; সেই অবস্থায়ই অভ্রান্ত অবস্থা। অভ্রান্ত অবস্থা বুঝি না বলিয়াই বুঝা-বুঝি। বুঝা-বুঝিটা ভ্রান্তি-মূলে যখন, তখনই ভ্রান্তি বুঝি।

বঙ্গাব্দ—২৮-১২-১৮] (৭৩) [জ

আজ হঠাৎ মা'র কথা মনে হইয়া, তোমাকে চিঠিতে যাহা লিখিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা লিখিতে পারিলাম না। কোন্ বেটা এ সংসারে, মা'র জন্য উন্মত্ততা আসিলে যুক্তি-তর্ক মীমাংসার কথায় থাকিতে পারে? এখন আমার প্রাণ মা'র কোলে উড়িয়া যাইবার জন্য পাগল। তোমার ভ্রান্তি-অভ্রান্তি মীমাংসায় আমার প্রাণ চায় না। আমাকে লোকে পাগল বা ভ্রান্ত বলুক, তাই বলিয়া কি আমি মা'র কোল ছাড়িব? অনেক দিন হয় সংসারের কুটিলতায় সেই আনন্দ-নিকেতন মাতৃ-ক্রোড়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আমার কথা বুঝিবে না। আমিও বুঝাইবার জন্য ব্যস্ত বা অস্থির নই। সাংসারিকতা কি এতই মধুর! বালক ধূলায় পড়িয়া চীৎকার করে, মা'র কাণেও যায় না? মাকে বলিবা—আমি একটু হাটিতে শিখিলে, বেটিকে ফেলিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ যাইব, আর বেটিকে কাঁদাইব। এক দিন আমার এই ৮।৯ মাসের শোধ লইব। আমি আর পারি না, আমার আর সহে না। আমার মা'র দ্বারা ইউরোপ, আমেরিকাদি পৃথিবীর অনেক স্থান পালিত—আমরা মাতৃহীনের ন্যায় চীৎকার করি! তাহার কারণ কি মা'র নির্দ্দয়তা নয়? মা থাকিলে

মায়ের এ-দুর্দ্দশা হইত না। আমরা ঐশ্বর্য্য ও পার্থিব সুখের জন্য লালায়িত নই। ভারত সন্তান দিব্য জ্ঞানের জন্য লালায়িত। মা শিক্ষা না দিলে কা'র কাছে শিখিব? মা-বাবার শাসন না থাকিলে নিশ্চয়ই বনে-জঙ্গলে উন্মাদের মত বেড়াইব—সাপে খাউক বা বাঘে খাউক—কোন কথায়ই ভীত হইব না. মাকে বুঝাইয়া দিবা,—নচেৎ একদিন এ হতভাগ্য সন্তান অযোগ্য হইলেও তাহার জন্য কাঁদিতে হইবে। আমি আদর-যত্ন না পাইলে থাকি না; আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইব, কা'র জন্য থাকিব? মা-বাপের আদর-যত্ন না পাইলে কে থাকে? কে বাঁচে? আজ প্রাণের ভাব নূতন রকম, তাই এই পত্রখানা আর এক রকম হইয়া গেল। আমার মনে হইতেছে—তুমি মাকে যেন কি বলিয়াছ—তাই মা আজ সন্তানের জন্য একটু ব্যস্ত। আমিও একটু আদর পাইয়া নিজ আবদার করিতে ত্রুটি করিব না মনে করিয়াছিলাম। আবার মাঝে মাঝে 'মাইরের' ভয়ে একটু একটু সঙ্কোচিতও হইতেছি। সংসারের সকলেই মা-বাপের আদর পায়, আমি কেন পাইব না? আমি দোষ করিলাম কি? শৈশবে লেখা-পড়ায় যত্ন না করায় লেখা-পড়া শিখি নাই—ভদ্র সমাজের ব্যবহার শিখি নাই, তাই ভদ্রতা জানি না। প্রতিপদে আমার লাঞ্ছনা,—আমার কাঁদিবার কপাল, তাই আমি

কাঁদি আমাকে কেবল মন্দ বলিলে চলিবে কেন? একটু ভাল বলিয়া দেখ দেখি—আমি ভাল হই কি না? আমি একটু সুখী হই কি না? তুমি রাত-দিনই সংসার নিয়া থাকিলে, আমি সংসার ছাড়া আর শিখিব কি? আমায় চৈতন্যের মত একটু হরিনাম শিখাও; আমায় রাম প্রসাদের মত মা—মা শিখাও। আমি শুনিয়াছি,—মার্কণ্ডেয়ের মত 'গুরু-গুরু' শিখিলে নাকি কোন জ্বালা থাকে না, মা-বাপ কোন জ্ঞানই থাকে না। নিজের মতলবে আমাকে সেইটা শিখাবে না, তাহা আমি বেশ জানি। আজ বুধবার, ২৮এ চৈত্র, বেলা ৭৷৮ টার সময় মা—মা আগুণ কেন আমার প্রাণে জ্বলিয়া উঠিল, ইহা তোমাদের নিকট জানিতে চাই, আর কিছু লিখিতে পারিলাম না। বুকের মধ্যে ধড়্ ফড়্ করে।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]